দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনজাতি সমাজ উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করেছে— পৃঃ ২৩

জিন্না, সুরাবর্দির পদধ্বনি আবার শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ২৯ জুলাই, ২০২৪।। ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

আমাদের জনজাতি সমাজ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৯ জুলাই - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

ঘোড়াকে পুকুরে আনা যায়, জল খাওয়ানো যায় কি? 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বিপর্যয়ের মধ্যেও জয় বিজেপির ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

জনাদেশকে অসম্মান করে গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিরোধী জোট ◻ ড. সচ্চিদানন্দ জোশী ◻ ৮

ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনের অবসান ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

জিন্না, সুরাবর্দির পদধ্বনি আবার শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ১১

দারিদ্র্য দূরীকরণে মোদী সরকারের সাফল্য প্রশংসনীয় ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৩

ইস্যু ভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সাফল্যের চাবিকাঠি ◻ অধ্যাপক ড. স্বাগত বোস ◻ ১৫

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে জরুরি শিল্পায়নের সঞ্জীবনী স্পর্শ ◻ গদাধর মৈত্র ◻ ১৭

ফড়ে ও আড়তদারদের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে ◻ তারক সাহা ◻ ১৮

বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনজাতি সমাজ উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করেছে ◻ ইন্দ্রমোহন রাভা ◻ ২৩

সাঁওতালি নৃত্যে রয়েছে শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার কৌশল ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৭

রাজ্যের জনজাতি এবং সাঁওতালি কৃষি সংস্কৃতির পরিচয় ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৮

ত্রিপুরায় খার্চিপূজা জাতি-উপজাতির মেলবন্ধন ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ৩১

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৩

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জনসঙ্ঘের মেদিনীপুর ও তার উত্তরাধিকার ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ৩৫

বাঙ্গলার বনবাসী ও গিরিবাসী গল্পকথায় সবুজের ছোঁওয়া ◻ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ খেলা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৫০

ফ ঃ ১

প্রকাশিত হবে
৫ আগস্ট,
২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৫ আগস্ট,
২০২৪

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট - ২০২৪-’২৫

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর স্বীকৃত স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরে ভারতীয় অর্থমন্ত্রক দ্বারা প্রতিটি আর্থিক বছরে বাজেট তৈরি হয়ে চলেছে। ভারত সরকারের তরফে বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব সংবলিত এই অর্থ সংকল্পপত্র পাঠ ও পেশ করেছেন। প্রস্তাবিত বাজেটের প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার আগ্রহ থাকে সকলেরই।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের বিস্তারিত আলোচনা করবেন শেখর সেনগুপ্ত, সুদীপ্ত গুহ, কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য, আনন্দমোহন দাস, বিমলশঙ্কর নন্দ, ড. পঙ্কজ রায় প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতীয় সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

ভারতীয় সংস্কৃতির আত্তীকরণ পরম্পরার কারণেই যুগ যুগ ধরিয়া এই দেশের জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজজীবনের অভিন্ন অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। রাবণের ন্যায় মহাশক্তিশালী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সহায়ক সুগ্রীবাদি মহাবলবান বানর সৈনিকরা অরণ্যবাসী জনজাতি সমাজের ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা জনজাতি সমাজ হইতেই প্রতিনিধিত্ব করিতেন। নগর ও অরণ্য সভ্যতার মিলনভূমি এই ভারতবর্ষ। মধ্যযুগের ইতিহাসেও ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। মহারাণা প্রতাপের সৈন্যবাহিনীর বৃহদংশ ভীল জনজাতি সমাজের মানুষ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, শিশোদিয়া বংশের রাজতিলক সম্পন্ন হইত কোনো ভীল সর্দারের অঙ্গুলির রক্ততিলকে। জনজাতি মাওলি সেনাদের সহায়তায় অত্যাচারী মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ হিন্দুপদপাদশাহি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আধুনিককালে ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধেও জনজাতি সমাজের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহের ন্যায় সমগ্র দেশে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া জনজাতি সমাজের যোদ্ধারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়া দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি, সিধু-কানু মুর্মুর লড়াইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের সূচনাবিন্দু বলা হইয়া থাকে। সমাজ সংস্কার ও দেশরক্ষার লড়াইয়ের জন্য জনজাতি সমাজ বীরসা মুণ্ডাকে 'ভগবান' অভিধায় ভূষিত করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জনজাতি সমাজের মাতৃশক্তিও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। ফুলো মুর্মু, ঝানো মুর্মু জনজাতি সমাজে বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি পাইয়াছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামী রানিমা গাইদিনল্যু দেবীর আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমগ্র ভারতবর্ষে জনজাতি সমাজের যোদ্ধারা জীবন বলিদান করিয়াছেন। এই সেইদিন, ১৯৪০ সালে, হায়দরাবাদের নিজামের দেশবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার থানু নায়ক এবং তাঁহার অনুগামীরা জীবনপণ লড়াই করিয়া আত্মাহুতি দিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই নগর সভ্যতা রক্ষায় অরণ্যবাসী জনজাতিরা সমান সহযোগ প্রদান করিয়াছে। জনজাতি সমাজের মানুষদের রক্তে রহিয়াছে ক্ষাত্রশক্তির সহজাত প্রকাশ। এই জন্মজাত ক্ষাত্রশক্তিকে ভারতবর্ষীয় সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ইংরাজশক্তি চক্রান্ত করিয়া বসে। ১৯৩০ তাহারা এই স্বভাবযোদ্ধা জনজাতিদের 'আদিবাসী' নাম দিয়া ভারতীয় সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। আর্য আগমন তত্ত্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যেই তাহাদের এই দুরভিসন্ধি। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ কিন্তু সংবিধানে 'আদিবাসী' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তথাপি তথাকথিত বিদ্বানরা ইংরাজপ্রদত্ত শব্দই ব্যবহার করিয়া চলিয়াছেন। এই সহজ সরল জনজাতি সমাজকে মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বহু পূর্ব হইতেই খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মান্তরিত করিয়া চলিয়াছে। সেবার আড়ালে এই কার্যে তাহারা বহুলাংশে সফল হইয়াছে। সম্প্রতি মণিপুরের অশান্তি সেই চক্রান্তেরই পরিণাম। দুঃখের বিষয় হইল, দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ মিশনারিদের 'সেবার আড়ালে'র চক্রান্তটি ধরিতে পারিতেছেন না। এই জনজাতি সমাজ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। ভারতের সমস্ত রাজ্যেই তাহারা রহিয়াছেন। বিশ্বের সম্মুখে ভারতের নাম উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহারা সমান সহভাগী। বিশেষ করিয়া ক্রীড়াজগতে তাহাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। জনজাতি সমাজের জীবনস্তর উন্নত করিবার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মদিনকে 'জনজাতি গৌরব দিবস' ঘোষণা করিয়া সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে। জনজাতি সমাজ আজ জাগ্রত সমাজের পরিচিতি লাভ করিয়াছে। ইহা গৌরবের বিষয় যে, ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপতি রূপে রহিয়াছেন শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি সমাজের উত্থানের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, স্বাধীনতার পর হইতেই অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম জনজাতি সমাজের উত্থানের জন্য নিরবধি কাজ করিয়া চলিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সতর্ক থাকিতে হইবে, জনজাতিদের মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস ও চক্রান্তও সমানভাবেই চলিতেছে।

সুভাষিতম্

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ রাজন স্বর্গস্যোপরি তিষ্ঠতঃ।
প্রভুশ্চ ক্ষময়া যুক্তো দরিদ্রস্য প্রদানবান্।।

হে রাজন, ক্ষমতাশালী হয়েও যিনি ক্ষমাশীল এবং নির্ধন হয়েও যিনি দানশীল— এই দুই প্রকার ব্যক্তি স্বর্গেরও উপরে স্থানপ্রাপ্ত হন।

ঘোড়াকে পুকুরে আনা যায়, জল খাওয়ানো যায় কি?

‘জাগরণ ও বিস্ফোরণ’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যথার্থভাবে হিন্দু একতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে যে চরম ইসলামি সাম্প্রদায়িক চরিত্র তৈরি হয়েছে তা মোকাবিলা করতে এটাই সঠিক রাস্তা। সহনশীল আর বিশ্বদর্শনধর্মী হিন্দুরাই তা পারে। শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। ঠিক সেই কারণেই রাজ্য বিজেপির পঙ্গু সংখ্যালঘু মোর্চা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর দাবি, এই মুহূর্তে এই রাজ্যে কোনো রাষ্ট্রবাদী মুসলমান নেই। তৃণমূল কাম বিদেশি সিপিএম-কংগ্রেস বহুদিন থেকে মুসলমানদের ভোটের বোড়ে বানিয়ে ফেলেছে। বেআইনি সুযোগ সুবিধা পেয়ে তারাও সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত হিন্দু আর মুসলমানের ডিএনএ সমান বলেছেন। কিন্তু এ রাজ্যের মুসলমানরা সেই সম্মানের যোগ্য নয়। মমতা-সেলিম আর অধীর-রাহুলরা এখানকার মুসলমানদের ভারতকে নিজের দেশ বা ‘মাতৃভূমি’ বলে ভাবনার চিন্তাকে বিষিয়ে দিয়েছেন। যথার্থ রাষ্ট্রবাদী দৃষ্টিতে শুভেন্দুবাবু সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

শুভেন্দুবাবু জানেন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তাই যতদিন না ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ নামক বিষ শব্দটি সংবিধান থেকে উঠে যাচ্ছে, ওই নামের আড়ালে বিজেপি ভিন্ন সমস্ত রাজনৈতিক দল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগাতে থাকবে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ ছিল। যেমন এখন আছে। তাহলে জরুরি অবস্থার সময় জোর করে কেন সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ ঢোকানো হলো?

এ রাজ্যের মুসলমানরা দুর্নীতি বোঝেন না। তারা নিরাপত্তা আর আরক্ষণ বোঝেন। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটবাক্সে তারা কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হননি। কারণ বিজেপি ছাড়া সবাই ভোট জিততে তাদের ব্যবহার করেছে। শুভেন্দুবাবু তাই বলেছেন যারা বিজেপির সঙ্গে আছে বিজেপি তাদের সঙ্গে আছে। যারা নেই বিজেপি তাদের সঙ্গে নেই। এটাই স্বাভাবিক। বিজেপি রাষ্ট্রবাদী দল। তারা ভারতে সমস্ত মানুষের বিকাশ চায়, তা হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান হোক না কেন।

বিজেপির কাছে প্যালেস্টাইন শত্রুদেশ নয়। কিন্তু কোনো একটি রাজ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় যদি উন্নয়নকে মান্যতা না দিয়ে তার বিরোধিতা করে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে তাকে সেই উন্নয়নের অংশীদার করা উচিত নয়। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের তা বোঝা প্রয়োজন। বিজেপির বিশ্বমানবতার দর্শনে এটি অগ্রাহ্য ধরে নিলেও শুভেন্দুবাবুর কথা, যুক্তি কোনোভাবেই খণ্ডানো যায় না। কারণ যারা প্রগতির সূত্র মানে না তাদের উন্নয়নের গতিপথ থেকে বাদ রাখাটাই বৈজ্ঞানিক ভাবনা। ঘোড়াকে পুকুরে আনা যায়, জল খাওয়ানো যায় না। ২০১৬ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রীসভায় কোনো মুসলমান প্রতিনিধি নেই বটে, তবে তিনি কোনো ভাবেই মুসলমান বিরোধী নন। শুভেন্দুবাবুও মুসলমান বিরোধী নন। তবে এ রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের কান বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তিনি তাদের ছাড়াই চলতে চেয়েছেন। এর জন্য হিন্দু একত্রীকরণ আর একতার প্রয়োজন।

শুভেন্দুবাবু সমোয়োচিত হিন্দু একতার ইঙ্গিত দিয়েছেন বটে, তবে ‘কালীমায়ের বোমা’ ব্যবহারের জন্য একতার সঙ্গে প্রথমে জুড়তে হবে ‘আলোড়ন’ এবং শেষে ‘বিস্ফোরণ’। তার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

অসমে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের ৩৩ শতাংশ (আনুমানিক ১.২৫ কোটি) বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, এই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এদের বেশিরভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ঝাড়খণ্ডেও তাই। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি ভোটের রাজনীতি করেন। রোহিঙ্গাদের বেআইনিভাবে আশ্রয় দেন। সাহস নেই বলেই তিনি হিমন্তের মতো কোনো তথ্য দেন না। অথচ ২০০৫ সালে সংসদে তিনি অনুপ্রবেশ বিরোধী নাটক করেছিলেন। হিমন্ত বিশ্বশর্মা অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। মমতা নন। লোকসভা ভোটে আনুমানিক এ রাজ্যের ৯২ শতাংশ মুসলমান ভোট মমতা পেয়েছেন। আবার সিপিএম-কংগ্রেসের হিন্দু ভোটও তার ঝুলিতে গিয়েছে। এই রাজ্যে ৩০ শতাংশ মুসলমানের বাস। ভোটার আনুমানিক ২৩-২৫ শতাংশ। এর সিংহভাগ মমতা পেয়েছেন। তার সঙ্গে জুড়েছে ২৬ শতাংশ হিন্দু ভোট। শুভেন্দুবাবু সমোয়োচিত হিন্দু একতার ইঙ্গিত দিয়েছেন বটে, তবে ‘কালীমায়ের বোমা’ ব্যবহারের জন্য একতার সঙ্গে প্রথমে জুড়তে হবে ‘আলোড়ন’ এবং শেষে ‘বিস্ফোরণ’। তার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

বিপর্যয়ের মধ্যেও জয় বিজেপির

আত্মতুষ্টেষু দিদি,

আনন্দ হওয়ারই কথা। ২২ আসন থেকে বেড়ে ২৯ হয়েছে আপনার দলের লোকসভা আসনের সংখ্যা। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে ৩০ পার করতে চেয়ে ১২-তে আটকে গিয়েছে বিজেপি। ২০১৯ সালের চেয়ে ৬টি আসন কম। সে বারে জেতা আটটি আসন হাতছাড়া হয়েছে। নতুন করে এসেছে কাঁথি ও তমলুক। কিন্তু দিদি, একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে, আসনসংখ্যা কম হলেও পরিসংখ্যান অনুযায়ী অতীতের তুলনায় বিজেপির ভালো ফল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আশাপ্রদ। ফলে আপনার খুব বেশি আত্মতুষ্টির কোনও কারণ নেই।

গণতন্ত্রে আসন সংখ্যাই আসল কথা। সেটা আমি জানি দিদি। সেই হিসেবে আপনি ১৭টি আসন বেশি পেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু রাজনীতিতে পরিসংখ্যানও অনেক কথা বলে। হিসাবটা আপনাকে আশা করি বোঝাতে পারব। ২০১৯ সালে ১৮ আসনে জয়ের পাশাপাশি বিজেপি রাজ্যে ৪০.৬০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই তুলনায় এবার ভোট কমেছে। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় বেড়েছে প্রাপ্ত ভোটের হার। ২০২১ সালে ছিল ৩৭.৯৭ শতাংশ। এবার সেটা বেড়ে ৩৮.৭৩ শতাংশ হয়েছে। আসনসংখ্যার বিচারে বিজেপি পিছিয়ে থাকলেও পরিসংখ্যানের দিক থেকে দলের অগ্রগতি হয়েছে। সেই পরিসংখ্যানের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের পুর এলাকার ফল। রাজ্যের ১২১টি পুরসভার মধ্যে ৬৯টিতেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। দু'টিতে কংগ্রেস এবং শাসক তৃণমূল ৫১টিতে। এর বাইরে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি পুরনিগমের ফলও বিজেপির পক্ষে অতীতের তুলনায় ভালো।

এবার বিজেপি যে শহরাঞ্চলে তুলনামূলক ভালো ফল করেছে তার প্রমাণ কলকাতাতেই। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসনের মধ্যে। ২০২১ সালে হওয়া পুরনির্বাচনে তৃণমূল জিতেছিল ১৩৭টিতে। আর বিজেপি জয় পেয়েছিল ৩টিতে। সব ক'টিই কলকাতা উত্তরে। লোকসভা নির্বাচনের ফলের নিরিখে সেই উত্তরে বিজেপি এগিয়ে ২৪টি ওয়ার্ডে। ২০১৯ সালের তুলনায় চারটি ওয়ার্ড বেড়েছে। তবে কলকাতা দক্ষিণের ২৬টি ওয়ার্ডে ২০১৯ সালে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও এবার সেটা কমে হয়েছে ২০। তবে সব মিলিয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ের তুলনায় এবার কলকাতায় ফল অনেকটাই ভালো।

দিদি, আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে, রাজ্যে এমন ৯টি আসন রয়েছে যেখানে বিজেপি অতীতে কখনও এগিয়ে থাকেনি। এর মধ্যে রয়েছে বড়ঞা, জঙ্গিপুর, সন্দেশখালি আসন। এছাড়া রয়েছে পূর্বমেদিনীপুরের তমলুক, পাশকুড়া পূর্ব, নন্দকুমার, মহিষাদল, চণ্ডীপুর, রামনগর আসন। প্রসঙ্গত, তমলুক একমাত্র লোকসভা আসন যেখানে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ৭টি বিধানসভা এলাকাতেই। তবে বিজেপি বেশি খুশি জঙ্গিপুরের ফল নিয়ে। ২০২১ সালে লক্ষাধিক ভোটে হারা আসনে এবার এগিয়ে দল।

> **টাকার লোভ দেখিয়ে যে ভোট আপনি পেয়েছেন সে ভোট আগামী ভোটেও মিলবে এমন গ্যারান্টি কোথায়? বরং, আপনার দল ও সরকারের আরও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে গেলে মুশকিল হতেই পারে। তাই আপনার অনুগত ভাই হিসেবে অনুরোধ, এবার কিছু গঠনমূলক কাজ করুন।**

২০২১ সালে বিজেপি মোট ৭৭টি বিধানসভা আসন জিতেছিল পশ্চিমবঙ্গে। সেই জেতা আসনগুলির মধ্যে ৬২টিতে এবারেও এগিয়ে দল। এর মধ্যে আবার ৪টি আসন ছাড়া সর্বত্র ব্যবধান বেড়েছে পদ্মের। আবার ২০২১ সালেও জিততে না পারা এমন ২৮টি আসনেও এবার দল এগিয়ে রয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে ৭০টি বিধানসভা আসনে কম ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে দল। সেই তালিকা অনুযায়ী, ১০ হাজারের কম ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা আসনের সংখ্যা ৪৯। আর ১০ হাজারের বেশি কিন্তু ১৫ হাজারের কম ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা আসনের সংখ্যা ৪৯। আর ১০ হাজারের বেশি কিন্তু ১৫ হাজারের কম ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বিধানসভার সংখ্যা ২১টি।

তবে দিদি, আমি মনে করি এগিয়ে থাকার এত পরিসংখ্যান থাকলেও বিজেপিকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সংগঠনের জোর আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু আপনার জন্য স্বস্তি কিন্তু রইল না। টাকার লোভ দেখিয়ে যে ভোট আপনি পেয়েছেন সে ভোট আগামী ভোটেও মিলবে এমন গ্যারান্টি কোথায়? বরং, আপনার দল ও সরকারের আরও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে গেলে মুশকিল হতেই পারে। তাই আপনার অনুগত ভাই হিসেবে অনুরোধ, এবার কিছু গঠনমূলক কাজ করুন। পশ্চিমবঙ্গে বেশি আসন মিললেও দিল্লিতে সরকার গড়ার স্বপ্ন তো মেটেনি। এবার অন্তত সৎ উপায়ে রাজ্যের মানুষের জন্য কিছু করুন। কারণ, এটা ঠিক যে যা ফল হয়েছে তাতে বিজেপির একেবারে হতাশ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। আনন্দ নাই হতে পারে কিন্তু শিক্ষা নেওয়ার বড়ো সুযোগ এনে দিয়েছে এবারের ফল। □

অতিথি কলম

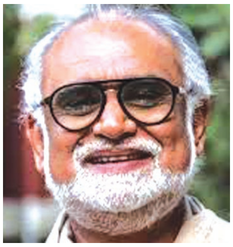

ড. সচ্চিদানন্দ জোশী

জনাদেশকে অসম্মান করে গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিরোধী জোট

যেখানে ‘বিরোধ’-এর লক্ষ্য প্রতিরোধ না হয়ে সরকারের গতিরোধে পর্যবসিত হয়েছে, শুধুমাত্র বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা চলছে, সেই উদ্দেশ্যে নিম্নমানের মনোভাবের মাধ্যমে বিতণ্ডা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে— সেখানে এইসব কিছুর মতাদর্শগত ভিত্তির সন্ধান বৃথা ও নিরর্থক।

সম্প্রতি নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গের সমাপন অনুষ্ঠানে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য সর্বত্র আলোচিত হয়। বিশ্লেষণের আতশকাচের নীচে ফেলে তাঁর বলা প্রতিটি কথার কাটাছেঁড়া চলে। তাঁর এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ছিল ভারতীয় রাজনীতি আগামীদিনে কোন খাতে প্রবাহিত হবে, তা স্থির করার যোজনা-স্বরূপ। রাজনৈতিক বিদ্বেষ যে কত নিম্ন স্তরে পৌঁছেছে, সমগ্র দেশের কাছে আজ তা এক গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। সরসঙ্ঘচালকের ভাষণের মাধ্যমে এই সমস্যা নিরসনে উপস্থাপিত হয়েছে একটি সদর্থক চিন্তাধারা ও দিশানির্দেশ। ভারতীয় গণতন্ত্র রক্ষায় তাঁর কথিত সমাধানমূলক উপদেশ-পরামর্শ ভবিষ্যৎ উপলব্ধির পাথেয়।

এই ভাষণে তিনি বলেন যে জনাদেশকে প্রকৃষ্টতা দানের লক্ষ্যে, তার সম্মান আমরা আগেও যেমন করেছি, তেমনই এই নির্বাচনেও জনাদেশের মর্যাদা রক্ষার পরম্পরা অনুসৃত হয়েছে। লোকমত বা জনাদেশের সম্মান-মর্যাদার বিষয়ে প্রায় ৬০ বছর আগে দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর কলমে উঠে আসে জওহরলাল নেহরুর উল্লেখ। সেই সময় রাজ্য পুনর্গঠনের ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে পৃথক পৃথক দাবিসমূহ উত্থাপিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে এই দাবিগুলির মধ্যে কোনগুলি জনতার প্রকৃত ইচ্ছা তা নির্ধারণ করা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে ছিল একটি কঠিন বিষয়। নেহরুর সামনে খাড়া হওয়া এই সমস্যা প্রসঙ্গে দীনদয়াল উপাধ্যায় লিখেছিলেন— ‘পণ্ডিতজী যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনতার ইচ্ছাতেই একটি গণতান্ত্রিক দেশ পরিচালিত হয়। কিন্তু কোনো দু'জন ব্যক্তির ইচ্ছা একরকম হয় না। এই পরিস্থিতিতে সেখানে যখন কোটি কোটি লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন, সেখানে এত বড়ো একটি দেশের সব মানুষ একটিই ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন— এই অভিন্নতা সম্ভবপর নয়’।

গণতন্ত্রে তর্ক-বিতর্কের পরম্পরা : এই প্রবন্ধে দীনদয়াল উপাধ্যায় গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার মান্যতা, সাধারণ মানুষের ওপর আস্থা-বিশ্বাসকে সর্বোপরি আখ্যা দিয়ে এই সবকিছুকে নস্যাৎ করার প্রবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় প্রাচীন শাস্ত্রোক্তি— ‘বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ব বোধঃ’-র উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছিলেন যে যদি অন্যদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে না শুনে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি সবার ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার ওপর জোর দিই, তবে তা ‘বাদে বাদে জায়তে কণ্ঠ শোষঃ’— এই উক্তির নামান্তর হবে। তাতে অন্য চিন্তাধারাকে চেপে দেওয়া চরিতার্থ হবে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় এই প্রবন্ধে আরও বলেন যে এই সব কিছু থেকে অনেক কদম এগিয়ে থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি যে কোনো তর্ক-বিতর্ককে তত্ত্বজ্ঞান আহরণের একটি মাধ্যমরূপে বিবেচনা করে। ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী, সত্য এক ও অদ্বিতীয় নয়। কারণ, আপেক্ষিক ভাবে বিচার করলে একই সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, পরখ করা যায়, এমনকী অনুভব করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তর্ক-বিতর্কের শাশ্বত পরম্পরা বিদ্যমান। তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ভারতীয় শাস্ত্র এবং কয়েক হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস। ‘বাদ’ অর্থাৎ তর্ককে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করার, তাকে অলংকৃত করার পরিচয় ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে পাওয়া যায়। তর্ক-বিতর্কের আভিজাত্য, গরিমার স্বরূপ শাস্ত্রার্থের মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয়।

তর্ক-বিতর্ক-বাকবিতণ্ডা : ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দীনদয়াল উপাধ্যায় লেখেন যে অন্যদের মত শোনা, অন্যদের মতে প্রতিফলিত চিন্তাধারাকে সম্মান করার অর্থ তাদের সামনে মাথানত করা নয়। তর্ক পরম্পরার কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপভেদ হলো— বিতর্ক। আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য ছিল বিতর্কের। কিছু বিতর্ক স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, বহু বিতর্ক তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু হালফিলে এই দেশ বিতর্কের সংস্কৃতিকেও পিছনে ফেলে আরও অবক্ষয়ের পথে দৌড়ে চলেছে। সেই পথে ধাবিত হয়ে সামনে এসেছে বিতর্কের চূড়ান্ত বিকৃত রূপ— বাকবিতণ্ডা বা ঝগড়া। গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও নিজের কথা ও মতাদর্শ বলপূর্বক অন্যদের

ওপর চাপিয়ে দেওয়া, বা ঝগড়া-বিবাদ খাড়া করে অন্য মত বা মতাবলম্বীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে খারাপ বা ভ্রান্ত ধারণার সঞ্চার করার প্রবণতা সমাজে আজ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণে ভারতে সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই প্রক্রিয়াকে কার্যত নস্যাৎ করে বা জনাদেশকে অসম্মান করে দেশের মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে— তার উদাহরণ আজ সর্বত্র দৃশ্যমান।

বিতণ্ডা খাড়া করার জন্য তথ্য বা যুক্তি-তর্কের কোনো প্রয়োজন নেই। ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির ছক সম্পূর্ণভাবে মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কখনও যা হয়ে ওঠে অতিনাটকীয়তার দ্বারা প্রভাবিত। সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত, চেতনা ও বিচারধারাহীন কিছু লোক অসার ও যুক্তিহীন বিতণ্ডার জন্ম দেয়। এই ধরনের লোকজনের সংখ্যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অবস্থানকারীদের অধিকাংশই তরুণ প্রজন্মের। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী এই যুব সম্প্রদায় প্রথম প্রথম মনোরঞ্জনের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলিতে উপস্থাপিত রাজনৈতিক বিতণ্ডার এই দৃশ্যাবলী দেখে, পড়ে ও শোনে। পরে ধীরে ধীরে এইগুলিকেই সামাজিক বাস্তবতা ভেবে বসে। রিল ও মিম সংবলিত মনোরঞ্জনের এই মায়াজাল কখন, কীভাবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে রাজনৈতিক যথার্থতার স্বরূপ পরিগ্রহ করেছে তা ভুলের ফাঁদে পা দেওয়া নতুন প্রজন্ম বুঝতে পারে না। এইভাবে নানা কৌশলে তৈরি হতে থাকা পরিকল্পনা ও ছক দেশের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠছে।

জনাদেশকে অসম্মান : ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে একটি নির্বাচনী জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও জনমানসে অনবরত বিভ্রান্তি সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এর পিছনে নিহিত রয়েছে কায়েমি স্বার্থ ও চক্রান্ত। সেই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জয়ী নির্বাচনী জোটকে পরোক্ষে পরাজিত প্রতিপন্ন করার খেলা চলছে। ষড়যন্ত্রের এই রূপ ও চরিত্র গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় জনমত। এই জনমত বা জনাদেশ হলো নির্বাচনরূপী গণতান্ত্রিক বৃক্ষের ফল-স্বরূপ। তাঁর রচনায় জনাদেশের সম্মান রক্ষায় প্রযুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ করে দীনদয়াল উপাধ্যায় লিখেছিলেন যে— জনাদেশের সম্মান তিনিই করতে পারেন, যিনি জনপ্রিয়তা, যশ ও খ্যাতির মোহ ত্যাগ করতে পেরেছেন। এই ক্ষেত্রে সর্বত্যাগী, বৈরাগ্য চেতনাসম্পন্ন, দ্বন্দ্বাতীত ভারতীয় সন্ন্যাসীদের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। দীনদয়াল যখন এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সেই সময় ভারতের সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হয়তো অন্যরকম ছিল। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে নির্বাচনে জয়ীদের বিরুদ্ধে আজ যে ধরনের ভাষার প্রয়োগ ঘটছে, তাদের উদ্দেশে যে কুরুচিকর ইঙ্গিত ও অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে, তা ভারতীয় রীতি ও সংস্কৃতির বিরোধী। বিশেষত সামাজিক মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি যে অভদ্র ভাষা ও অপসংস্কৃতিমূলক বাক্যের প্রয়োগ অহরহ ঘটে চলেছে তা এই সংস্কৃতিহীনদের তরফে জনাদেশের প্রতি অবজ্ঞাস্বরূপ। ভারতীয় জনাদেশকে পদে পদে অসম্মান করে চলা এই কুচক্রীরা বিরোধ-বিতণ্ডার দ্বারা জনমানসকে অনবরত বিভ্রান্ত করে চলেছে। এমনকী নির্বাচিতদের হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে তাদের তরফে লাগাতার সংবিধানের দোহাই দেওয়া চলছে। 'দেশের সংবিধান সংকটে'— এই স্লোগানকে নির্ভর করে তৈরি হওয়া বিরোধী জোটের কারসাজি যখন সফল হলো না, তখন তাদের তরফে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত সরকারকে সরাসরি অপমান করার কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। সংবিধানের দোহাই পেড়ে গণতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে ধাবমান এই বিরোধী জোটের দ্বারা দেশের জনাদেশকে অপমান, অসম্মান করে চলার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা নিশ্চিতভাবে সাংবিধানিক পরম্পরা লঙ্ঘনের শামিল।

বিপক্ষ না প্রতিপক্ষ : সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে দেশের জনাদেশকে তাচ্ছিল্য ও নস্যাৎ করার অধিকার এই বিরোধী পক্ষকে কে দিয়েছে? যদি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বা খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা সহকারে নির্বাচনী ফলাফলকে তারা গ্রহণ করতো, আসন সংখ্যার বিচারে এই নির্বাচনের পরিণামকে যদি তারা সহজ ভাবে মেনে নিত, তবে গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করার এই কুদৃশ্য তাদের তরফে মঞ্চস্থ হতো না। সংসদের ভেতরে ও বাইরে তাদের তরফে সংঘটিত যে কীর্তিকলাপ আজ সবার চোখে দৃশ্যমান।

কার্যকর্তা বিকাশ বর্গের সমাপন পর্বে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত তাঁর বক্তব্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তা হলো— 'বিপক্ষ' (বিরোধী পক্ষ)-এর পরিবর্তে 'প্রতিপক্ষ' শব্দের প্রয়োগ। তিনি বলেন যে— কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ধ বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ কখন বিপক্ষে পরিণত হলো, তা বোঝা গেল না। ভারতীয়রা সেই পরম্পরাজাত যেখানে সব ধরনের বিচারধারাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানানোর রীতি রয়েছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে— 'সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্'। আইনি প্রক্রিয়ায় বাদী ও বিবাদী— এই দুইটি পক্ষ থাকে। দুই পক্ষই কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার বিষয়ে জনস্বার্থে, বিধি মোতাবেক সমাধানের লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল থাকে। বিনোবা ভাবের উল্লেখ-সহ 'সহচিত্তমেষাম্' শব্দাবলীর / শব্দবন্ধের ব্যাখ্যার সারসংক্ষেপ স্বরূপ সরসঙ্ঘচালক বলেন যে প্রতিটি ব্যক্তির প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাদের চিন্তা-চেতনার ঐক্যটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক। প্রতিপক্ষ বা প্রতিবাদীদের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে বিচারাধারা- আধারিত, তথ্যপূর্ণ, সদর্থক বিরোধিতা কাম্য ও প্রত্যাশিত। কিন্তু যেখানে 'বিরোধ'-এর লক্ষ্য প্রতিরোধ না হয়ে সরকারের গতিরোধে পর্যবসিত হয়েছে, শুধুমাত্র বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা চলছে, সেই উদ্দেশ্যে নিম্নমানের মনোভাবের মাধ্যমে বিতণ্ডা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে— সেখানে এইসব কিছুর মতাদর্শগত ভিত্তির সন্ধান বৃথা ও নিরর্থক।

(লেখক ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রের সদস্য সচিব)

ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনের অবসান

কলকাতা হাইকোর্টের সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির কথা মনে পড়বে স্বস্তিকার পাঠকদের যিনি কর্ম থেকে অবসরের মুহূর্তে বলেছিলেন, জজগিরি করার আগে তিনি সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ করতেন, এখন অবসর গ্রহণের পর আবার তা করতে পারবেন। মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে সরকারি চাকরিরত অবস্থায় কি আরএসএস করতে কোনো বাধা আছে? সরকারি চাকরির নিয়মাবলীর মধ্যে পড়ে আপনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। কিন্তু আরএসএস তো কোনো রাজনৈতিক দল নয়, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। তবে সরকারি চাকুরেদের আরএসএস করতে বাধা কোথায়? আরও একটা প্রশ্ন জাগে, আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির নামকে অনিবার্যভাবে জুড়ে দেওয়ার প্রবণতাই কি এহেন মানসিকতার জন্ম দিয়েছে?

জানা গিয়েছে, ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ডি ফ্যাক্টও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বুদ্ধিতে সরকারি চাকুরিরত কর্মীদের আরএসএস করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। আসলে ওই বছরের ৭ নভেম্বর সংসদে গোহত্যা বিরোধী তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। আরএসএস এব্যাপারে লক্ষ লক্ষ জনসমর্থন জোগাড় করেছিল। পুলিশের গুলিতে অনেক সাধুর মৃত্যুও হয়। ১৯৬৬ সালের ৩০ নভেম্বর, আরএসএসের আন্দোলনে কাঁপতে থাকা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সরকারি কর্মীদের আরএসএসে যোগদান নিষিদ্ধ করেছিল। তার আগে গান্ধীজী হত্যার মিথ্যা দায়ে জওহরলাল নেহরুর সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা এবং তারপরে জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে স্বয়ংসেবকদের ওপর নির্মম অত্যাচার ইতিহাসের পাতায় কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। এই অত্যাচার অবিচারের জবাব অবশ্য দেশের মানুষ দিয়েছেন। বাকি ছিল স্বয়ংসেবকদের আরএসএস করার ব্যাপারে কালো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের। প্রায় ছয় দশক উঠে গেল সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইন।

স্বাভাবিকভাবেই এই নিষেধাজ্ঞা তোলা নিয়ে কংগ্রেস ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক (সংযোগ) জয়রাম রমেশ ৯ জুলাই জারি করা একটি অফিস মেমরেন্ডাম সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি শেয়ার করেছেন। নথিটি কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ, পাবলিক গ্রিভ্যান্স এবং পেনশন দপ্তরের। সেই নথি অনুযায়ী, এরপর থেকে আরএসএস-এর কোনও কাজে যোগ দিতে বাধা থাকবে না কোনও সরকারি কর্মীর। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যও ওই নথিরই স্ক্রিন শট এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক ট্যুইটার) পোস্ট শেয়ার করে জানিয়েছেন, ৫৮ বছর আগে করা 'অসাংবিধানিক' একটা নিষেধাজ্ঞা অবশেষে তুলে নিয়েছে মোদী সরকার।

> **এরপর থেকে আরএসএস-এর কোনও কাজে যোগ দিতে বাধা থাকবে না কোনও সরকারি কর্মীর।**

ঘটনা হলো, আরএসএস কোনোদিনই রাজনীতির বিষয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার যে পাঠ দিয়ে স্বয়ংসেবকদের তৈরি করে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাঠায়, তাতেই কংগ্রেসের থরহরি কম্পমান অবস্থা। শুধু আজকে নয়, চিরদিনই। তাই যে আতঙ্ক থেকে সেদিন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সরকারি কর্মীদের সঙ্ঘ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, আজ তারা ক্ষমতায় না থাকলেও সেই একই পরিস্থিতিই রয়েছে, এখনো সর্বত্র কংগ্রেস আরএসএস জুজু দেখছে।

কংগ্রেসের পাশাপাশি দেশের জেহাদি লবিও শঙ্কিত। তাদের মুখপাত্রস্বরূপ মিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও ক্ষোভ উগরে দিতে ছাড়েননি। এআইএমআইএম প্রধান এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন, 'এই অফিস মেমোটি দেখায় যে সরকার সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস কার্যকলাপে অংশগ্রহণের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। যদি সত্য হয়, এটা ভারতের অখণ্ডতা ও ঐক্যের পরিপন্থী।' ছয় দশকের অবিচারের শেষ হয়েছে, এতে আমাদের দেশের পাক-লবির বুক যে টনটন করবে সেটাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গত, আগামী বছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। তার আগে এই সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার স্বয়ংসেবকদের উৎসাহিত করবে। যদিও স্বয়ংসেবকরা তাঁদের দৈনন্দিন কাজে কোনো নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করেন না। উল্লেখ্য, এর আগে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন করেছিল যে সরকার যেন এই বিষয়টি নিয়ে ফের বিবেচনা করে। সেই সময় তারা কেশুভাই প্যাটেল পরিচালিত গুজরাটের বিজেপি সরকারের কথাও উল্লেখ করেছিল।

এনিয়ে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে কনফেডারেশনের তরফে মোদীর কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাধু সিংহ জানিয়েছিলেন, আরএসএস একটি সামাজিক সংগঠন। অনেক সরকারি কর্মী সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নিতে চান। কিন্তু উক্ত নিষেধাজ্ঞার জেরে, বিভাগীয় শাস্তি হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁরা দেশ তৈরির মতো একটা মহান কাজে অংশ নিতে পারছেন না। তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক যেন আগের সরকারি নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ সরকারি চাকরিজীবীরাও চান যাতে তাঁরাও দেশ তৈরির কাজে অংশ নিতে পারেন। এরপরই মোদী সরকার সেই কালো নির্দেশ তুলে নেয়।

প্রসঙ্গত, এতদিন নিষেধাজ্ঞা থাকায়, ইচ্ছে থাকলেও এই রাষ্ট্রবাদী সংগঠনটির সদস্য হতে পারতেন না সরকারিরা। বর্তমানে তাঁদের এই বাধা আর থাকলো না।

জিন্না, সুরাবর্দির পদধ্বনি আবার শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে

অমিত কুমার চৌধুরী

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের আগে ও পরে পশ্চিমবঙ্গে যা শোনা বা দেখা যাচ্ছে তাতে হিন্দু বাঙ্গালিরা ভীষণ আতঙ্কিত। কারণ, ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতা পরিস্থিতির পূর্বকালে ঘটে যাওয়া অখণ্ড বঙ্গের হিন্দু নির্যাতনের সেই বীভৎস, অমানবিক গণহত্যার এক মর্মন্তুদ কাহিনি। হিন্দুরা কি পুনরায় অত্যাচারের শিকার হবে, কিংবা দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হবে? কিন্তু কী এমন হয়েছে যে, বাঙ্গালি হিন্দুদের পুনরায় উদ্বাস্তু হতে হবে!

তাহলে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক।

কলকাতা পৌরসভার মেয়র তথা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুসলমান নেতা ফিরহাদ হাকিম যা বলেছেন—

পাকিস্তানের একটি পত্রিকার সাংবাদিককে মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাকে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, চলুন আপনাকে মিনি পাকিস্তান দেখাচ্ছি।

ফিরহাদ হাকিম মুসলমানদের একটি সভায় বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলবে।

তিনি মুসলমানদের একটি সভায় আরও বলেন যে, যারা ইসলামে জন্ম নেননি, তাদের দুর্ভাগ্য। শুধু তিনি এখানেই থেমে থাকেননি, বলেছেন যে, অমুসলমানদের ইসলামের ইবাদত করতে হবে, তাতে আল্লাকে খুশি করা যাবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির হুংকার ছাড়লেন এই বলে, আমরা এই জেলায় ৭০ শতাংশ। ৩০ শতাংশ হিন্দুকে দু' ঘণ্টার মধ্যে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেব। চোপড়ার এক চুনোপুটি তৃণমূল নেতা প্রকাশ্য স্থানে এক প্রেমিক যুগলকে অবৈধ সম্পর্কের কারণে নির্মম বেত্রাঘাত করলে তার প্রভু স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ইসলামি দেশে এই রকম শাস্তির বিধান আছে। ফুরফুরা শরীফের ত্বহা সিদ্দিকীও সম্প্রতি এক ভাষণে বলেছেন যে তাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলনরত এক কিশোর হিন্দু ছাত্রকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। তার পরিবার আজও কোনো সরকারি সাহায্য পায়নি। নদীয়ার এক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা বন্ধ করা হয় মুসলমানদের চাপে। মহরম ও দশমী এক দিনে পড়ায় দশমীর শোভাযাত্রার অনুমতি মেলেনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে।

ইতিহাস থেকে যে জাতি শিক্ষা নেয় না, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইতিহাস-বিস্মৃত বাঙ্গালি হিন্দুর নিশ্চিহ্ন হওয়া বেশি দূর নয়। স্বামী প্রণবানন্দজীর ভাষায় এই দুর্গতির মূলে হিন্দুর দুর্মতি।

সম্প্রতি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গোরা হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। অদ্ভুতভাবে কোনো মুসলমান মেয়েদের উপর একটিও অসম্মানের ঘটনা ঘটেনি। নির্বাচনের আগে মুসলমান তৃণমূলি গুন্ডারা হিন্দু ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করছে যাতে ভোট না দেয়। এটা কেশপুরের ঘটনা। ওখানকার বিজেপি প্রার্থী তো বলে ফেললেন যে কেশপুর মিনি পাকিস্তান হয়ে গেছে। দিদির দুধেল গাইরা তাকে এলাকায় যেতে বাধা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় ইট, পাথর, ভাঙা কাচের বোতল ছোড়া হয়। হিন্দুদের শোভাযাত্রার অনুমতি সহজে মেলে না কিংবা মিললেও প্রশাসন নির্ধারিত পথে যেতে বাধ্য করা হয়। এই রাজ্যের বহু মুসলমান অধ্যুষিত স্থানে পুলিশও যেতে ভয় পায়। মাঠে-ঘাটে বোমা ফেটে নিরীহ শিশু, বালকের মৃত্যু হয়। থানার পুলিশ তৃণমূলি গুন্ডাদের ভয়ে সিটিয়ে থাকে। কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় নেতারা পুলিশকে হুমকি দেয়, প্রহার পর্যন্ত করে। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য অস্বাভাবিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে বাজেট থেকে।

ইমাম ও মোয়াজ্জেম ভাতা দিয়ে মুসলমান তোষণ করে ধর্মীয় কট্টরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। ইসলামে কখনও নারী পুরুষ এক সঙ্গে ইদে বা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে না, তা সত্ত্বেও হিন্দু মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ইদের নমাজে একবারে মুসলমান সেজে মুসলমান ভোটের জন্য তাঁর কত না চেষ্টা। মমতা ব্যানার্জি বাঙ্গালি হিন্দু

ফঃ ২

আর শেখ হাসিনাও বাঙ্গালি মুসলমান। মমতা মুসলিম ভোটের জন্য মুসলমান হওয়ার ভান করেন। কিন্তু হাসিনা তো হিন্দু ভোটের জন্য হিন্দু হওয়ার ভান করেন না! মমতা কী ভক্তিভরেই না নমাজ পড়েন, অথচ শিবলিঙ্গে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ফুল ছোঁড়েন। ত্রিপুরায় এক মন্দিরের পুরোহিত তাঁর গোত্র জিজ্ঞাসা করলে বলেন 'মা মাটি মানুষ'। হিন্দু ধর্মকে নিয়ে কী চূড়ান্ত অবজ্ঞা!

তৃণমূলের উঠতি যুবনেত্রী রাজন্যা হালদার দেবাংশু ভট্টাচার্যের নির্বাচনী জনসভায় দেবাংশুকে মহাদেব, ঈশ্বর, যিশু ও আল্লার অংশ বলে বিপাকে পড়লেন। হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি কিন্তু ইসলামপন্থীরা দেবাংশু আল্লার অংশ বলাতে প্রতিবাদ করায় রাজন্যা শীঘ্রই তার মন্তব্য মুছে ফেলেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনসভায় বলেন যে তার সরকার এত উন্নতি করেছে যে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত বাইবেল, কোরান শেষ হয়ে যাবে, তবুও তার উন্নয়নের কথা শেষ হবে না। আর যায় কোথায়! মুসলমান গেল খেপে। পরে ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা। তৃণমূলের ভাতাজীবী হিন্দু কবি সুবোধ সরকার এবং সিপিএমের নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রকাশ্য রাস্তায় গোমাংস ভক্ষণ করে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান দায়িত্ব পালন করলেন, অথচ বাম নেতা মহম্মদ সেলিম শুয়োরের মাংস খেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার পরীক্ষা দিলেন না। সব দায় যেন হিন্দুদের।

আরেক বাম মনোভাবাপন্ন বিশ্ববন্দিত মহাজ্ঞানী অমর্ত্য সেন পশ্চিমবঙ্গের এত অন্যায়, দুর্নীতি, অত্যাচার, খুন, জখম তাঁর চোখে ধরা পড়ে না। যাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ঢাকা থেকে বিতাড়িত, নিজের ধনসম্পত্তি হারিয়ে মা-বোনেদের ইজ্জত খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন, তাদেরকেই বলছেন ইদ মুবারক। তাঁর মতো মহাজ্ঞানী লোকের চোখে পড়ে না, মনে প্রশ্ন জাগে না কেন বিশ্বে ৫৭টা মুসলমান দেশের কোথাও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নেই?

তৃণমূলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ শিবলিঙ্গে কনডোম পরালেন, কবি শ্রীজাত মহাদেবের ত্রিশূলেও কনডোম পরালেন, সাংসদ মহুয়া মৈত্র মা-কালীকে মাংসখেকো বলে অপমান করলেন। তারাই আবার ড্যাং ড্যাং করে ভোট জিতে গেলেন। তারা আরও বেশি করে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করার উৎসাহ পাবে। আসলে হিন্দুধর্ম হলো ফুটবল, তাই একে শিশু, বালক, যুবক বৃদ্ধ সবাই লাথি মেরে আনন্দ পায়। কিন্তু ইসলাম লোহার বল, তাই বৃদ্ধ বা শিশু তো ছেড়েই দিলাম শক্তিশালী যুবকও অপমান করার দুঃসাহস দেখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, প্রয়োজন না পড়লেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন পড়লে নিজেকে রক্ষা করতেও পারে না। কিন্তু মুসলমান প্রয়োজন না পড়লেও নিজেকে দৃঢ় ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন পড়লে অপরকে বেদম মার দেয়। এর কারণ, হিন্দুর গায়ে জোর নেই, আর মুসলমানের গায়ে জোর আছে। না,মুসলমানের সামাজিক জোর আছে, হিন্দুর তা নেই।

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে এসে ভয়ে ভয়ে থাকে, অথচ বুক ফুলিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বসতি তৈরি করে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করা হচ্ছে। সীমান্তের বহু এলাকা হিন্দুশূন্য। গ্রামের নাম শিবপুর, লক্ষ্মীপুর। কিন্তু সেই গ্রামে একজনও শিব বা লক্ষ্মীপূজা করার লোক নেই। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থান মিনি পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ এই ভোট লোলুপ নেতাদের বদান্যতায়।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তো সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হিন্দুরা সেখানে থাকতে পারে না। না হয় সেটা ইসলামিক দেশ, হিন্দুরা সেখানে জিম্মি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কি হিন্দুরা ওদের থেকে ভালো আছে? উপরোক্ত ঘটনাগুলি কীসের ইঙ্গিত বহন করছে? ইসলাম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করলে বোঝা যায় যে মুসলমানরা যা করছে তা ওদের মজহবি শিক্ষা অনুযায়ী ঠিকই করছে। মজহবের যেমন শিক্ষা তেমনই আচরণ করবে। অতএব ফিরহাদ হাকিম তাঁর মজহবি শিক্ষা অনুযায়ী ঠিক বলেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হিন্দুরা কী করতে পারে এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে?

পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, উদারবাদী রাজনৈতিক নেতা, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা নির্লজ্জ নীরবতা পালন করছেন। কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। যেন সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন অথবা ভাবখানা এই রকম ওসব ছোটোখাটো ব্যাপার, ব্যতিক্রমী ঘটনা, গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর ভগ্নাংশ যদি কোনো হিন্দুদের পক্ষ থেকে হতো কী তুলকালাম কাণ্ড না করে বসত এই সব তথাকথিত উদারবাদীরা। ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন বলে পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, দেশব্যাপী গগন বিদারিত করে ফেলতো তারা। কী অদ্ভুত দ্বিচারিতা না? হিন্দুরা খুব সহজেই ভুলে গেল নোয়াখালির দাঙ্গার কথা, ভুলে গেল সান্তাহারের হিন্দু নিধন। কখনোই স্মরণ করে না কী ভয়ংকর হিন্দু হত্যা হয়েছিল কলকাতায় ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে। এই সেই শহর যা হিন্দুদের সাধের সাংস্কৃতিক ও অসাম্প্রদায়িক শহর, যা নিয়ে হিন্দুদের গর্বের শেষ নেই। অথচ যে ব্যক্তিটি অসমসাহস ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিন্দুদের রক্ষা করেছিলেন সেই গোপাল মুখোপাধ্যায়কে অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালি চেনেই না। কলকাতা ছাড়া পাকিস্তান পেয়ে মহম্মদ আলি জিন্না বলেছিলেন— আমি পোকায় কাটা পাকিস্তান পেলাম। সমগ্র বঙ্গ না পাওয়ার বেদনা আজও মুসলমানরা ভুলতে পারেনি, তাই পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে জিন্নার স্বপ্ন পূরণের চেষ্টার প্রক্রিয়ার একটি অংশ ববি হাকিমের এই মন্তব্য। ইতিহাস থেকে যে জাতি শিক্ষা নেয় না, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইতিহাস-বিস্মৃত বাঙ্গালি হিন্দুর নিশ্চিহ্ন হওয়া বেশি দূর নয়। স্বামী প্রণবানন্দজীর ভাষায় এই দুর্গতির মূলে হিন্দুর দুর্মতি। পশ্চিমবঙ্গের বাতাসে জিন্না, সুরাবর্দির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, অথচ বাঙ্গালি হিন্দুর কোনো হেলদোল নেই। □

দারিদ্র্য দূরীকরণে মোদী সরকারের সাফল্য প্রশংসনীয়

আনন্দ মোহন দাস

বিজেপি বিরোধী দলগুলি সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের কর্মসূচিকে জুমলা আখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকে। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কিন্তু মোদী সরকারের উন্নয়নের সুফল যে নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে তা সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কিছুদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশের ২৫ কোটি মানুষ গরিবিরেখার উপরে উঠে এসেছে। অর্থাৎ ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এর মূল কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সরকারি ভরতুকীতে বিনা পয়সায় রেশন।

একটি নতুন সমীক্ষায় আরও জানা গেছে, ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র্য ২০১১-১২ সালের ২১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৮.৫ শতাংশ হয়েছে। দারিদ্র্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং যারা মিথ্যা ন্যারেটিভ ছড়িয়ে জনগণকে ভুল বোঝাচ্ছেন তাদের মুখে যোগ্য জবাব। চরম দারিদ্র্য অকেটাই কমেছে। যদিও সামান্য কিছু মানুষ জীবনে বিপর্যয়ের কারণে আবার গরিব হয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সার্ভের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, মাথা গণনা অনুসারে দারিদ্রের অনুপাতিক হারের অনুমান করা হয়েছে তেন্ডুলকর কমিটির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি সাপেক্ষ গরিবি রেখার উপর ভিত্তি করে। যার মাধ্যমে সরকার তার পরিকল্পনাগুলি তৈরি করে এবং বাস্তবায়িত করে থাকে। ২০১৭ সালের ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বব্যাংক দ্বারা গরিবিরেখার নির্ধারিত আয়ের পরিমাণ হলো প্রতিদিন ২.১৫ ডলার।

NCAER (National Council of Applied Economic Research)-এর সোনালদে দেশাইয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ একটি গবেষণায় জানিয়েছেন যে গ্রামে মাথা গণনা অনুসারে দারিদ্র্যের অনুপাত ২০১১-১২ সালের ২৪.৫ শতাংশ থেকে কমে এখন ৮.৬ শতাংশ হয়েছে এবং শহরে ১৩.৪ শতাংশ থেকে কমে ৮.৪ শতাংশ হয়েছে। এসবিআইয়ের গবেষণায় দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার আরও কম। এসবিআইয়ের গবেষণা মূলত NSSO-র Household Consumption Expenditure-এর উপর নির্ভরশীল। সেই অনুযায়ী মাথা গণনা অনুসারে দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার গ্রামীণ এলাকায় ৭.২০ শতাংশ এবং শহর এলাকায় ৪.৬ শতাংশ। মার্চ মাসে পূর্বতন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর সি রঙ্গরাজন ও অর্থনীতিবিদ এস মহেন্দ্রদেব অনুমান করেছিলেন যে এইচসিইএস (হাউসহোল্ড কনজিউমার এক্সপেন্ডিচার সার্ভে) অনুযায়ী ২০১১-১২-র তুলনায় ২০২২-২৩ সালে ভারতের দারিদ্র্যের হার ১০.৮ শতাংশ হবে। নীতি আয়োগের সিইও বিভি আর সুব্রমনিয়াম জানিয়েছেন Household Consumer expenditure-এর তথ্য অনুসারে প্রাথমিক অনুমানে দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্যের স্তর ৫ শতাংশের নীচেও নামতে পারে। দেশাইয়ের গবেষণা অনুসারে জানা যায়, পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে সরকারি ভরতুকির পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য সরকারি বহুমুখী প্রকল্পে অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের সামাজিক সুরক্ষায় বেশি জোর দিতে হবে, অর্থাৎ জন্মগত গরিব হওয়ার চেয়ে অসুস্থতা, বিবাহ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ গরিব হলে তার উপর বেশি জোর দিতে হবে।

IHDS তথ্য অনুযায়ী ২০১১-১২ এবং ২০২৩-২৪ সালে দেখা গেছে ৮.৫ শতাংশ গরিবের মধ্যে ৩.২ শতাংশ জন্মগত গরিব এবং ৫.৩ শতাংশ গরিব হয়েছে জীবনে দুর্ঘটনার কারণে। এখানে আরও কয়েকটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান উল্লেখ করা

হয়েছে তা নিম্নরূপ :

গত ২০ বছরে ব্যক্তি ভিত্তিক দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার কমেছে। ২০০৪-০৫ সালে গরিব নয় এরকম মানুষের শতকরা হার ছিল ১৯.৬ শতাংশ, ২০১১-১২ সালে ৩২.৯ শতাংশ এবং ২০২২-২৪ সালে ৫৪.১ শতাংশ। ২০০৪-০৫ সালে গরিবের সংখ্যার অনুপাত ছিল ৩৮.৬ শতাংশ, ২০১১-১২ সালে ২১.২ শতাংশ এবং ২০২২-২৪ সালে ৮.৫ শতাংশ। ২০০৪-০৫ সালে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৪১.৯ শতাংশ, ২০১১-১২ সালে ৪৫.৯ শতাংশ এবং ২০২২-২৪ সালে ৩৭.৪ শতাংশ।

তাছাড়া গণবণ্টন ব্যবস্থায় মাথাপিছু মাসিক ভরতুকির পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ সালে ছিল ৩৫ টাকা, ২০১১-১২ সালে ৮৭ টাকা এবং ২০২২-২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ টাকা হয়েছে। সরকারি সাহায্যের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১. ২০০৪-০৫ সালে গ্রামীণ এলাকায় ঘরপিছু ৩৭৫ টাকা, শহর এলাকায় ৩৭১ টাকা।

২. ২০১১-১২ সালে গ্রামীণ এলাকায় ১২৯২ টাকা, শহর এলাকায় ১০১০ টাকা।

৩. ২০২২-২৪ সালে গ্রামীণ এলাকায় ৬০৭৯ টাকা, শহর এলাকায় ৪০১৫ টাকা।

আরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ভারতের সামাজিক সুরক্ষা জালে গরিবদের চিহ্নিত করে তাদের সকলকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সামাজিক প্রকল্পগুলির টাকা নগদে এবং দ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই গবেষণাপত্র ইন্ডিয়া পলিসি ফোরাম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও গরিব মানুষদের চিহ্নিতকরণের কাজটি প্রায়ই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যায়।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে যে আর্থিক বৃদ্ধি ও গরিবি হ্রাস পাওয়া অর্থনীতিতে একটি গতিশীল আবহাওয়া তৈরি করে, যার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে। যদিও ভারতের কাছে সমহারে উন্নয়ন একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রকল্পগুলি কার্যকরী করে তুলতে হবে এবং এ বিষয়ে নমনীয় হতে হবে। বিভিন্ন সংসদীয় প্রণালীর মাধ্যমে পাশ হওয়া বিভিন্ন অধিকার সংবলিত সামাজিক প্রকল্পগুলি কখনও কখনও পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ MGNREGS প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে তিনটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে চলতে হবে।

১. ঝুঁকি বিমা, ২. প্রকল্পের নমনীয়তা, ৩. প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো নির্মাণ।

আরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে গরিবদের চিহ্নিতকরণ এবং তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ রেখে সম্পূর্ণভাবে টাকার জোগানের ব্যবস্থা করা সরকারের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপক বিস্তারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ বৃদ্ধি করতে না পারলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

উপরোউক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে মোদী সরকারের আমলে দেশে গরিবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে যা অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক। □

ইস্যু ভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সাফল্যের চাবিকাঠি

অধ্যাপক ড. স্বাগত বোস

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিধানসভার ভোটে জয়ী হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল ২০১১ সালে। এরপর ২০১৬ এবং ২০২১ দু'বারই তারা ভোটে জয়ী হয় এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে সরকার গড়ে। এর আগে সিপিএমের নেতৃত্বে বামপন্থীরা ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৭ সালে। এই দুটো দল কীভাবে ক্ষমতায় এল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ করা যাক— অতীতের জনসঙ্ঘ যা বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টি কীভাবে গুটি গুটি পায়ে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করলো।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা ইয়াহিয়া খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের শায়েস্তা করতে চাইছিলেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হলো নির্বিচারে গণহত্যা। শুরু হয়েছিল হিন্দুদের গণহত্যা দিয়ে পরে অবশ্য মুসলমানরাও পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা থেকে বাদ যায়নি। সেই সঙ্গে হয়েছিল একের পর এক মন্দির ধ্বংস এবং পূজারিদের কলমা পড়িয়ে তার পর মেসিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া। শুরুটা হয়েছিল ঢাকার রমনা কালীবাড়ি থেকে। গণহত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার এবং ধ্বংসলীলার ফলে এক কোটির উপর শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। ফলে ভারতের অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ পড়েছিল।

ফলত ভারতকেও জড়িয়ে পড়তে হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্দ্বন্দ্বে। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তান সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত হয়। তার ফলেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো। সেই যুদ্ধে জয়ের ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা ভারত জুড়ে এতটাই হয়েছিল যে পরবর্তী লোকসভার ভোটে বিপুল ভাবে জয়লাভ করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি।

তবে তাঁর এতো জনপ্রিয়তার মধ্যেও কিন্তু তৎকালীন বিরোধী রাজনীতিবিদরা হীনম্মন্যতায় না ভুগে কংগ্রেস ও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চরম মূল্য বৃদ্ধি ঘটে

(ফাইল চিত্র)

ছিল যার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার শেষ ছিল না। এর ফলে গুজরাটে নব নির্মাণ আন্দোলন শুরু হয়। ইস্যুভিত্তিক এই ছাত্র আন্দোলনে সাধারণ মানুষও শামিল হন। কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী চিমন ভাই প্যাটেল পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওদিকে বিহারেও ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ পরে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এরপর সারা ভারত জুড়ে রেল ধর্মঘট শুরু হলো জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে। ওদিকে বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস মিত্র কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই) ছাড়া সমস্ত বিরোধীরা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে একজোট হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন শুরু করলেন।

এরপরেই ১৯৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জগমোহন লাল তাঁর যুগান্তকারী রায়ে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে ইন্দিরা গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। আসলে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ভোটে রায়বেরিলি থেকে ভোটে দাঁড়ান এবং প্রতিপক্ষ রাজনারায়ণকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী একজন সরকারি কর্মচারী যশপাল যাদবকে তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট করেছিলেন। যেটা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের শামিল। আদালতের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রায়ে এটাও বলা হয় যে আগামী ৬ বছরের মধ্যে তিনি কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে যান রায় বাতিল করার জন্য। ১২ দিন পরে সুপ্রিম কোর্ট রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিল কিন্তু রায় বাতিল হলো না। ফলে তাঁর সংসদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার রইলো কিন্তু ভোটদানের অধিকার হারালেন। সেই সঙ্গে সংসদীয় ভাতা পাওয়ারও অধিকার রইলো না। ইন্দিরা গান্ধী বুঝে গেলেন বিপদ আসন্ন। ওদিকে ২৫ জুন ১৯৭৫ সালে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিলেন। সেই দিনই মাঝরাতে অর্থাৎ ২৫ জুন ১৯৭৫ সালে দেশে জারি হলো জরুরি অবস্থা। এর ফলে নাগরিক অধিকার হরণ করা হলো। বিনা কারণে, বিনা বিচারে নাগরিকদের জেলে বন্দি রাখার জন্য মিশা

আইন চালু হলো। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রাষ্ট্রপতির একটি কলমের খোঁচায় চলে গেল। গ্রেপ্তার হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবাণীর মতো নেতারা। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো কিশোর কুমারের গান বন্ধ করে দিল। এমনকী বেশ কিছু রবীন্দ্রসংগীতের উপরও জরুরি অবস্থার কোপ পড়েছিল। কোপ পড়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'-এর উপর।

প্রায় দুবছর পর ১৯৭৭ সালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইন্দিরা গান্ধীকে জানাল যে বিরোধীরা এখন ছত্রভঙ্গ এবং ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা এখন এতটাই যে ভোট হলেই কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়লাভ করবে। ফলে তিনি ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা তুলে নিলেন। খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলো। জনসঙ্ঘ এবং আরও অনেকগুলো দল মিলে তৈরি হলো জনতা পার্টি। নির্বাচনে জনতা পার্টি বিপুল ভাবে জয়লাভ করে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে সরকার গড়লো। অটলবিহারী বাজপেয়ী বিদেশ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। লালকৃষ্ণ আডবাণী হলেন পূর্তমন্ত্রী। কিন্তু এই সরকার বেশি দিন টিকলো না। দুটি কারণে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন জনতা সরকারের পতন ঘটলো।

১. জনতা দলের বামপন্থীদের দাবি যে জনসঙ্ঘের যাঁরা জনতা পার্টিতে আছেন তাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্য হওয়া চলবে না। অর্থাৎ দ্বৈত সদস্য হওয়া চলবে না। প্রাক্তন জনসঙ্ঘের কোনো সদস্যের পক্ষে এই শর্ত মানা সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁরা সঙ্ঘের আদর্শেই নিজেকে এবং নিজের সংস্কারকে গড়ে তুলেছেন।

২. চৌধুরী চরণ সিংহের ছিল প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা।

ফলে সরকার ভেঙে গেল। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বাইরে থেকে সমর্থনে চরণ সিংহের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলো। ওদিকে ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল পূর্বতন জনসঙ্ঘের সদস্যরা জনতা দল থেকে বেরিয়ে গঠন করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি। এরপরের ইতিহাসও কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনকে সঙ্গী করে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে সিপিএম-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট জনতা পার্টির ঘাড়ে চড়েই ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীকালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষি জমি চাষিদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়াকে ইস্যু করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং এই ইস্যুতেই দীর্ঘ আন্দোলন করেন। ফলে জনগণও মানসিক ভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তার ওপর ছিল বামফ্রন্টের প্রবল অত্যাচার। তার ফলস্বরূপ ২০১১ সালে মমতার প্রতি জনগণের বিপুল সমর্থন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আরোহণ।

এর পরের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জন্য খুবই করুণ। যাদেরকে বিশ্বাস করে জনতা জনার্দন ক্ষমতার অলিন্দে এনেছিল দেখা গেল তারা ভয়ংকর দুর্নীতিগ্রস্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ। তাদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়ে গেল। শুরু হয়েছিল সারদা কেলেঙ্কারি থেকে। তারপর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষার কথা চিন্তা না করে অযোগ্য প্রার্থীদের কাছে চাকরি বিক্রি করে কুবেরের ধন সংগ্রহ করেছে। বাংলা দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে সরাসরি সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। সরকারটাই একদল দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের দ্বারা চালিত হচ্ছে। মা-বাবা কষ্ট করে টাকা খরচ করে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলেছেন। তাঁদের সন্তানরা চাকরি পাবে না। পাবে কিছু অযোগ্য প্রার্থী, কারণ তারা এজেন্ট ধরে এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে চাকরি কিনে নিয়েছে।

কলকাতা কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন পৌরসভাতেও সিবিআইয়ের হানা চলছে। অর্থাৎ সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। খাদ্য দপ্তরেরও পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ এসেছে সিবিআই এবং ইডির হাতে। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্থান হয়েছে গারদের অভ্যন্তরে। সেই সঙ্গে রাজ্যে কোনো শিল্প নেই। মনে হয় না কোনো শিল্পপতি এই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্যে আসবেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে তিনটি ইস্যুতে আন্দোলনে নামতে হবে—

১. দুর্নীতি, ২. কর্মসংস্থান, ৩. শিল্পহীন পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টিকেই ঠিক করতে হবে তাঁরা ক্ষমতায় আসার জন্য এই ধরনের ইস্যু নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করে জনগণকে নিজের দিকে নিয়ে আসবেন না সারাক্ষণ পিসি ভাইপো বলে গালাগাল দিয়েই দায়িত্ব শেষ করবেন। এইসব করলে আন্দোলন থেকে, জনগণ থেকে এবং ক্ষমতায় আসা থেকে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। একবার জনগণ থেকে দূরে সরে গেলে তাদের পক্ষে ফিরে আসা কঠিন থেকে কঠিন হয়ে উঠবে। তাছাড়া নিজের শক্তি সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। ভীত, শক্তিহীন ও আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ নিজে এগোতে পারে না। অন্যকে বা একটা দলকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। অন্যের শক্তিকে ভর করে খুব বেশি দূর যাওয়া যায়। শিখরে পৌঁছানোর কথা তো ভাবাই যায় না। তাই নিজের শক্তিতে বলীয়ান দলই পারে জনগণকে সঠিক পথ দেখাতে। সম্প্রতি তারা তাদের কর্মী সম্মেলনে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে দল এবার সঠিক পথে এগোতে পারবে। □

পাত্রী চাই

বিএসসি, বি-টেক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। গুজরাটে কর্মরত, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ৩২ বছরের পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ : ৯৪৩৪২০৬৯৮৮

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে জরুরি শিল্পায়নের সঞ্জীবনী স্পর্শ

গদাধর মৈত্র

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে জরুরি হলো শিল্পায়ন। জরুরি হলো বৃহৎ উৎপাদন শিল্প চালু হওয়া। কারণ, এই মুহূর্তে শিল্পায়ন না হলে পশ্চিমবঙ্গ যে পরিস্থিতিতে রয়েছে তার থেকে আরও অতলে তলিয়ে যাবে। পরবর্তী প্রজন্ম এই রাজ্যে আদৌ কাজের সুযোগ পাবে না। কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্য বা ভিনদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হবে।

এ রাজ্যে যারা এই মুহূর্তে স্কুল থেকে পাশ করে পেশাদার জগতের দিকে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে, তারা কেউই নিশ্চিতভাবে এ রাজ্যে কোন কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবে বা কীভাবে উপার্জন করবে তার কোনো উজ্জ্বল উদাহরণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না। গত তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেখছে যে এই রাজ্যে শিল্প সম্ভাবনাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে। তা সেটা বিড়লা হোক বা টাটা। এরাজ্যে যখনই কেউ শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করেছে তখনই সামাজিক অধিকারের দাবি তুলে বিভিন্ন মহল থেকে নানা আন্দোলনের নামে তা থমকে গিয়েছে। নতুন করে শিল্পায়ন করার কথা বলা হলেও তার বাস্তবায়ন হতে দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র কাগজে কলমে শিল্পের প্রতিশ্রুতি!

বর্তমানে এই রাজ্যে উপার্জন বা কর্মসংস্থান বলতে বিভিন্ন শপিং মল বা রেস্তোরাঁয় চাকরি। সুইগি বা জোম্যাটোতে বিভিন্ন কাজ। ওলা বা উবেরের কাজ। বিভিন্ন ছোটো ছোটো বেসরকারি হাসপাতাল খোলা হয়েছে। সামান্য কিছু কর্মসংস্থান সেখানে হচ্ছে, তবে সেটা নিয়মিত নয়। সেখানে কর্মরতদের যা উপার্জন হয়--- তা সম্মানজনকভাবে সংসার চালানোর পক্ষে উপযোগী নয়।

এছাড়া আরও একটি বিষয় যেটা সকলের নজরে এসে থাকবে এবং সেই বিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বা কোনো কোনো নোবেলজয়ী মাঝে মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সেটা হলো— রাজ্য জুড়ে এখন সর্বত্রই ছোটো-বড়ো-মাঝারি রেস্তোরাঁ ও পাব চালু হচ্ছে। বলা ভালো সেই রেস্তোরাঁগুলিতে ভিড়ও হচ্ছে। এই রেস্তোরাঁর বিক্রি কতটা হয় সেটা ভিড় দেখে অনুমান করা যায়। তবে এই রেস্তোরাঁ চালু করে কর্মসংস্থানের সমস্যার কতটা সমাধান হচ্ছে বা শিল্পায়নের প্রক্রিয়া কীভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে— তা নিয়ে বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, একটু তলিয়ে দেখলেই জানা যাবে যে সেই সমস্ত রেস্তোরাঁ রাজ্যের শাসকদলের কোনো না কোনো নেতা বা তার পরিবারের দ্বারা পরিচালিত এবং সেই কারণে সেটা রমরমিয়ে বিনা বাধায় টিকে আছে। আরও একটা বিষয় নজরে আসতে পারে তা হলো রাজ্য জুড়ে নিত্যনতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। রাজ্য সরকার প্রণীত নতুন আইনের সাহায্য নিয়ে একদিকে যেমন লাইন দিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে নানান বিশ্ববিদ্যালয় চালু হচ্ছে, তেমনই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অসংখ্য কলেজ ও বিদ্যালয়ও চালু হচ্ছে। কিন্তু সেখানে তো কাগজে-কলমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা। আদতে কি সেটা হচ্ছে? একদমই না। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বা শিক্ষকতা করছেন তাদের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া সংখ্যাও যথেষ্টই কম। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুরু থেকেই রুগ্ন থেকে যাচ্ছে। একটা সময় অসংখ্য বিএড কলেজ চালু হয়েছিল। শিক্ষা দুর্নীতির পর্দা উন্মোচনের পর দেখা যায় যে এই সমস্ত বিএড কলেজের ৯০ শতাংশই বেআইনিভাবে অনুমতি জোগাড় করে চালু হয়েছিল। দীর্ঘদিন এসএসসি-র পরীক্ষা না হওয়ার দরুন এখন যা পরিস্থিতি তাতে এইসব বিএড কলেজে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তলানিতে এবং যারা সেখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাদেরও ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার।

শিল্পায়নের নাম করে সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট দলের এক প্রাক্তন তারকা ইউরোপে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত কারখানা খোলার কথা ঘোষণা করলেন। সেই কারখানা এখন বছর ঘুরে গেলেও বাস্তবায়িত হতে কেউ দেখতে পায়নি। এমনকী সেই ইস্পাতের কারখানা কোথায় চালু হবে সেই স্থানও নিয়মিত ব্যবধানে পরিবর্তিত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

শিল্পায়ন হলে এখানে একদিকে যেমন ইস্পাতের কারখানা চালু হতে পারে। তার সঙ্গে চালু হতে পারে গাড়ি তৈরির কারখানা। চালু হতে পারে মোবাইল তৈরির কারখানা। চালু হতে পারে কম্পিউটার সামগ্রী তৈরির কারখানা। এছাড়াও এখানে গড়ে উঠতে পারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। এই সমস্ত শিল্প ও কলকারখানা ইতিমধ্যেই কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে স্থাপিত হয়েছে। এই শিল্পগুলির হাত ধরে রাজ্যে প্রবেশ করবে আধুনিক প্রযুক্তি। আধুনিক প্রযুক্তিতে আধুনিক সামগ্রী উৎপাদিত হবে। আধুনিক সামগ্রী বিপণনের কেন্দ্র তৈরি হবে। রাজ্যে যে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার কলেজগুলি রয়েছে, সেখান থেকে পাশ করা নতুন প্রজন্ম নিয়মিত উপার্জনের একটি পথ দেখতে পাবে। ভিন রাজ্যে চলে যাওয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিভা নিজ রাজ্যে ফিরে এসে এই আধুনিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে চাকরি করার সুযোগ পাবে। এই উৎপাদন কেন্দ্র বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলিকে ঘিরে নানা ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপার্জনের পথ খুলে যাবে। এই রাজ্যের প্রায় ৭০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ একটি ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত হলে এই শ্রমিকদের সামনে নিজ রাজ্যে ফিরে এসে উপযুক্ত উপার্জনের এক অভূতপূর্ব সুযোগ আসবে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প স্থাপিত হলে সেই অঞ্চলগুলির মানুষের উপার্জনও বৃদ্ধি পাবে, তাদের জীবনের মানও পরিবর্তিত হবে। তাদের হাতে অর্থ এলে বিভিন্ন এলাকায় পর্যটন ও অন্যান্য স্থানীয় শিল্পগুলিও উপকৃত হবে। রাজ্যের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের হাতেও অর্থ আসবে, তাদের শান্তিতে থাকার স্বপ্ন সার্থক হবে। ☐

ফড়ে ও আড়তদারদের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে

তারক সাহা

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের এক সমীক্ষায় প্রকাশ— আগামী অর্থবছরে (২০২৫-'২৬) ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৭ শতাংশ, যা চলতি বছরের থেকে ০.২ শতাংশ বেশি। কিন্তু দেশের প্রধান ব্যাংকের (আরবিআই) আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের থেকে ০.২ শতাংশ কম। এর অর্থ হলো আগামী অর্থবছরে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং তার হাত ধরেই দেশের আর্থিক উন্নতি সাত শতাংশে পৌঁছে যাবে। ভারতে ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রামবাসী। অর্থাৎ তাদের উন্নয়নই হলো জাতীয় উন্নয়ন।

কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব অর্থনীতির যে অধোগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, দু'বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও তার উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখনও দুনিয়ার আর্থিক উন্নতির গড়পড়তা হার হলো মাত্র ৩.২ শতাংশ। তবে আগামী বছরের অনুমান অনুযায়ী ভারত ও চীনের হাত ধরে এই 'বিশ্ব আর্থিক বৃদ্ধির হার' ৪.৬ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে পৌঁছতে পারে। ভারত ও চীনের আর্থিক উন্নতি যেভাবে ঘটছে তাতে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী বছরের শুরুতেই এই দুই দেশের মিলিত জিডিপি সামগ্রিকভাবে বিশ্বের জিডিপির অর্ধেক হবে। ২০২৯ সাল নাগাদ চীনের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৩.৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমান বিশ্ব আর্থিক সংস্থার। তবে ভারতের আর্থিক উন্নয়নের ৮ শতাংশের আশেপাশে থাকবে। যদিও এর মধ্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলি হলো— (১) দেশ জুড়ে ভালো বর্ষা হতে হবে, (২) বেকারত্বের হার বর্তমানের তুলনায় কম হতে হবে ইত্যাদি। তাই ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বুনিয়াদি বিষয়গুলির প্রতি সরকারকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

আইএমএফ অবশ্য ভারতকে সতর্ক করে বলেছে যে উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। মুদ্রাস্ফীতির কারণে এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সমস্যা খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। রকেট গতিতে যেন বেড়েই চলেছে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য। এই ফুড ইনফ্লেশন দেশের গরিব- মধ্যবিত্ত-ধনী সব শ্রেণীকেই প্রভাবিত করছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে গত জুন মাসে ফুড ইনফ্লেশন বা খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৯ শতাংশের ওপর। এই খাদ্যের মুদ্রাস্ফীতি সামগ্রিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে ঠেলে তুলেছে ৫.১ শতাংশে।

এর ফলে সুদের হার কমাতে পারছে না রিজার্ভ ব্যাংক। সুদ কমানোর ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে মুদ্রাস্ফীতির ন্যূনতম হার ৪ শতাংশ রেখেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। মুদ্রাস্ফীতি ৪ শতাংশে না নামলে নতুন করে ঋণনীতি রূপায়ণ করতে পারছে না আরবিআই। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় আলু-পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যের চড়া মূল্য সাতবার লাগাতার বাজেট পেশ করে রেকর্ড সৃষ্টিকারী অর্থমন্ত্রীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলতে পারে।

বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য সূচকের এই বৃদ্ধির পিছনে সরকারি বণ্টন, মান্ডি ব্যবস্থা যত না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা। বৃষ্টির অপ্রতুলতা, খরিফ মরসুমের শুরুতে বৃষ্টির পরিমাণ কম হওয়ায় আনাজপাতির দাম বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী। অনেকের মতে এবারে এল নিনোর প্রভাবে সারা দেশ জুড়ে লাগাতার তাপপ্রবাহ এর জন্য দায়ী। ২০১৩ সাল থেকেই সমগ্র বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই যে বৃষ্টির স্বল্পতা খাদ্যপণ্য বিশেষত শাকসবজির মুদ্রাস্ফীতি সাড়ে সাত শতাংশে পৌঁছে দিয়েছে। এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সঙ্গী করে চলার পথে সরকারকে দেখতে হবে উৎপাদিত খাদ্য যাতে কম নষ্ট হয়। কৃষিজমি থেকে মান্ডি পর্যন্ত ফসল পৌঁছনো এবং তারপর বাজারে তা উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছনো পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে পচনশীল পণ্য ঠিকঠাক সংরক্ষণ এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের কাজটি করতে হবে সরকারকে। বাজেটে এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা সরকারের কাজ। আরও একটা দিক সরকারকে দেখতে হবে সেটা হলো— কৃষকদের কাছ থেকে বাজারে মাল পৌঁছনোর দুই প্রান্তে রয়েছে ফড়ে ও আড়তদারদের বিশাল সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে লাভের গুড়ের সবটুকু খেয়ে নেয় এই সিন্ডিকেট চক্র। এই কারণে দাম নিয়ন্ত্রণের দায় কেন্দ্রকে নিতে হচ্ছে এবং খাদ্যপণ্যের চড়া দামের জন্য সাধারণ মানুষের উষ্মার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে প্রশাসন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজি, ফলমূলের মধ্যে পেঁয়াজ বাদে বাকি সব কিছুই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত। কিন্তু দালাল রাজ, ফড়েদের চক্র, রাজ্যের শাসক দল ও পুলিশের লাগামছাড়া তোলাবাজিতে শাকসবজি, মাছ, ডিম, মুরগির মাংস-সমেত বেশিরভাগ খাদ্যপণ্যের অগ্নিমূল্যতে রাজ্যবাসী জেরবার। রাজ্য জুড়ে ফড়ে ও আড়তদারদের এই সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের শাসক দলের হাতে। রাজ্য সরকারের তরফে কড়া হাতে এই সিন্ডিকেটরাজ খতম করা প্রয়োজন। নইলে কৃষকরাও তাদের কৃষিজাত উৎপাদনের সঠিক আর্থিক মূল্য পাবে না, ফলে তারা কৃষিকাজে উৎসাহ হারাবে। আর শহরাঞ্চলের মানুষকেও খাদ্যসামগ্রী কিনতে গুণতে হবে অতিরিক্ত গাঁটের কড়ি। সাম্প্রতিক প্রবণতা অনুযায়ী তরুণ গ্রামীণ প্রজন্ম কৃষিকাজে উৎসাহিত হচ্ছে না, শহরমুখী জীবিকার প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে। এরকম হতে থাকলে বাড়তি জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণগত ভারসাম্য ভেঙে পড়বে। খাদ্যের অপ্রতুলতায় সৃষ্টি হতে পারে খাদ্যাভাব। এই কারণে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের আশু প্রয়োজন। □

মোদী ৩.০ নট আউট

জওহরলাল নেহরু এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর পর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪-এর এনডিএ সরকারের নেতা, অটলবিহারী বাজপেয়ী দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সুশাসন কাকে বলে। নরেন্দ্র মোদী বাজপেয়ীর হাত ধরে, দেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিজের দেশ সেবার স্বপ্নকে, বিজেপির সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলে দেশের সেবায় নিজেকে লিপ্ত করেছেন। ১৯৯৫ সালে বিজেপির হয়ে গুজরাটের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনী প্রচার এতটাই দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন, যে সেবারে ১২১টি আসনে কংগ্রেসকে হারিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করেছিল। তারপর এক সময় নরেন্দ্র মোদী হয়ে উঠলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হলেন। তাঁর নেতৃত্বে গুজরাট ২০০১ থেকে ২০১০-এর সময়সীমায় ১০.৯ শতাংশ বৃদ্ধির হার প্রদর্শন করলো, যা তখনকার নিরিখে সব রাজ্যের মধ্যে বেশি ছিল। এরপর বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে তিনি পা বাড়ালেন গুজরাটের উন্নতিকে সামনে রেখে। তিনি দেশের মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছাতে সক্ষম হলেন যে তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সর্বাধিক উন্নতির প্রমাণ পাবে। কংগ্রেসের বংশবাদ রাজনীতির কোপে যখন গোটা দেশ মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, বহিরাগতদের ক্রমাগত আক্রমণ, কয়লা কেলেঙ্কারি ও বিভিন্ন দুর্নীতির কবলে, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ নীরব হয়ে রইলেন। দেশবাসীর ক্ষোভ যখন ঊর্ধ্বগামী তখন নরেন্দ্র মোদী দেখালেন গুজরাটের সফল সরকারের এক বিচিত্র উদাহরণ।

এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। ২০১৪ থেকে তিনি দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য প্রচুর প্রকল্প এনেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'জনধন যোজনা', ও 'পিএম কিষাণ' যোজনা। সাম্প্রতিক 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প বিশ্বের সবচেয়ে সফল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম। 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'— এই প্রবাদ বাক্যটি আমাদের খুবই পরিচিত। নরেন্দ্র মোদী তার দেশসেবার স্বপ্নকে পূরণ করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর মানবদরদি মতাদর্শকে পাথেয় করে, এক সামান্য চা বিক্রেতা থেকে সফল রাজনীতিবিদ হয়ে সগৌরবে দেশ শাসন করে চলেছেন, এ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

—**ঈশানী সেনগুপ্ত,**
৭৫, সি.টি.আই. রোড, বিরাডিঙ্গী,
হাওড়া।

সালিশি ব্যবস্থা অতি উত্তম, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এটা ব্যবসা

আমার বাবা বড়ো সালিশিদার ছিলেন। পার্শ্ববর্তী ৪টা থানায় সব ধর্মের, সমাজের বড়ো কোনো সমস্যা হলেই তাঁকে সালিশির জন্য ডাকা হতো। এজন্য তিনি বাড়িতে কম থাকতেন। সব মিলিয়ে জীবনে আমি দু' ঘণ্টাও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। আমার বাবা সালিশি করার যোগ্য ছিলেন, কারণ তিনি আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর ছিলেন। সালিশি করা তাঁর জীবিকা ছিল না। আর তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের দলদাস ছিলেন না। থানার দারোগা থেকে সবাই তাঁর বিচার মেনে নিতেন। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আজ থেকে ৫০ বছর আগে সালিশিপ্রথা ছিল।

আমি বহু বছর জার্মানিতে আছি। জার্মানিতে সব লেভেলে সালিশি প্রথা আছে। বিশেষ করে যখন ইউনিয়নগুলি বেতন বাড়াবার জন্য আন্দোলন করে, মালিকের সঙ্গে একমত হতে পারে না, তখন সালিশিসভা করেই সমাধান করতে হয়। আমি একবার ইন্সুরেন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। এরা আমার প্রাপ্য দিতে চায়নি। পরে সালিশি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার প্রাপ্য আমি আদায় করি, কোর্টে যেতে হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সঙ্গে আমি এখনো যুক্ত। সেই গ্রামে আমার আত্মীয়রাই সরকারি দলের কর্মী ও সালিশিদার। সরকারি দলের লোকেরাই ক্লাবের হর্তাকর্তা হয়। এরাই বকলমে ক্লাবের হয়ে সালিশিসভা করে। এরা আমাকে বলেছে, সালিশি যাদের করে, তাদের থেকে কোনো ঘুষ নেয় না, তবে সালিশি করার জন্য একটা অংশ ধার হিসেবে নেয়, যে ধার আর শোধ করে না। কম বেশি ২০ শতাংশ। যে এই ২০ শতাংশ বা তার বেশি দেবে, তার পক্ষে রায় দেওয়া হয়। ধার দেবার কথা বলে না দিলে, কোনো অজুহাত দিয়ে খুব মারধর করা হয়। এসব হিন্দু গ্রামের কথা।

মুসলমান গ্রামেও সালিশিসভার জন্য টাকা দিতে হয়। মসজিদেও দিতে হয়। না দিলে শরিয়তি কায়দায় ফতোয়া দিয়ে বিচার হয়। পাশে বিরোধী দলেরও কেউ থাকে না, কারণ এখানে মসজিদকে সঙ্গে নিয়ে সালিশি করা হয়। তারা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি কায়দায় সালিশি চলছে।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

ফিরহাদের কথা কী ইঙ্গিত দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে ?

সাম্প্রতিক কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র এবং রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তাকে বলতে শোনা যায় যে 'যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদের দুর্ভাগ্য। তারা দুর্ভাগা যারা মুসলমান নয়। তাদের ইসলামের আসার আমন্ত্রণ জানানো

ফ ঃ ৩

হবে। আমরা যদি তা করি তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন। ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত একটি ধর্মীয় মঞ্চ থেকে তিনি এই মন্তব্য করেন। ফিরহাদের এই মন্তব্য ঘিরে হিন্দুরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে বাঘাযতীনে ১৬ জুলাই একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে গেলে স্থানীয় প্রশাসন তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে তাদের উপর লাঠি চার্জ করে এবং তাদের থানায় ধরে নিয়ে যায়। ফিরহাদের এই বক্তব্য নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক কথায় দায় এড়িয়েছেন। কিন্তু উদ্বেগে রয়েছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। ফিরহাদের কথাটা সত্যি হবে না তো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ক্ষেত্রে? হিন্দু সমাজ কি এখনও নিদ্রায় থাকবে! জাগো হিন্দু, এখনও সময় আছে, নিজে বাঁচো আর সমস্ত হিন্দুসমাজকে বাঁচাও।

—শুভময় দেব,
বারুইপুর, কলকাতা।

হিন্দুদের সচেতন হতে হবে

সম্প্রতি ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'যারা মুসলমান হয়ে জন্মায়নি, তারা দুর্ভাগা'। তাই পশ্চিমবঙ্গের সবাইকে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিতে বলেছেন। ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের একজন মন্ত্রী হয়ে নিজের ধর্মের জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তৃণমূলের কোনো হিন্দু নেতার ক্ষমতা আছে হাকিম সাহেবের মতো, যারা হিন্দু হয়ে জন্মায়নি তারা দুর্ভাগা এবং তাদের হিন্দু হবার আহ্বান জানানো?

কিছুদিন আগে যে রকমভাবে 'বঙ্গ বিবেক'-এর উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী এবং সম মতাদর্শের অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন কলকতার রাজপথে ভোট পরবর্তী হিংসায় বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর শাসকদলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, পাড়া ছাড়া, গ্রাম ছাড়া, প্রাণের ভয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া হিন্দুদের রক্ষার্থে পথে নেমেছিল, ঠিক সেরকম ভাবে আরও ব্যাপক আকারে সনাতন হিন্দুদের নিয়ে আন্দোলন, সর্বোপরি হিন্দু ভোটব্যাংক তৈরি না করা যায় , তাহলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা বাংলাদেশ, পাকিস্তানের হিন্দুদের থেকেও ভয়ংকর হবে।

—সঞ্জয় মুখার্জী,
শিবপুর, হাওড়া।

রক্ষকই-ভক্ষক

গত ১৭ জুলাই গোটা রাজ্য তথা কলকাতাকে পঙ্গু করে রাখল একটি মজহবি উৎসব। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে জনজীবন ব্যাহত করে রাজ্য জুড়ে পালন করা হলো ওই উৎসব। রাজপথ থেকে ওলিগলি সমস্ত বন্ধ করে দিয়ে যানচলাচল ব্যাহত করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলা হলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লাগামহীন তোষণের ফলে দিনের পর দিন এক চূড়ান্ত অব্যবস্থার চিত্র রাজ্যজুড়ে ফুটে উঠেছে। উৎসবের নামে এভাবে জনজীবন স্তব্ধ করে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলা একরকমের অত্যাচারই বটে।

শুধুমাত্র ইদ বা মহরম নয়, বেশকিছু হিন্দুদের উৎসবও আজ তৃণমূলীদের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানেও সেই নোংরা রাজনীতির খেলা চলছে। এই মিলন উৎসবে হিন্দু মুসলমান শামিল হলেও মহরম বা ইদ উৎসবে শুধুমাত্র মুসলমানদের দৌরাত্ম্য প্রকট হয়ে উঠেছে, সেখানে হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নেই। শাসকগোষ্ঠীর এই নোংরা রাজনীতিই সৃষ্টি করেছে এই ভেদাভেদ। এই কূটনৈতিক মনোভাবাপন্ন রাজনীতিই অত্যন্ত নিম্নমানের ইসলামিক মানষিকতার পরিচয় দেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে মহরম উৎসবের মিছিলে শামিল মানুষগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তৃণমূলের শাসনই ইসলামের শাসন।

এই দুর্নীতি ও অব্যবস্থার উপর ভর করে অরাজকতা ও হিংসার রাজনীতিকে সম্বল করে শাসন ক্ষমতায় মমতা ব্যানার্জি, ফিরহাদ হাকিমের মতো বেশ কিছু হিন্দুবিদ্বেষী বসে রয়েছেন। হিন্দুরাই পারে সম্মিলিত হয়ে এক জোটবদ্ধ হয়ে এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

—সম্রাট শীল,
বরানগর, কলকাতা।

পঞ্চম বাহিনী এবং ভারতবর্ষ

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে চাণক্য একটা রাজনৈতিক কথা বলেছিলেন 'কোনো দেশ বা সেই দেশে বসবাসকারী মানুষজনকে নিজেদের আজ্ঞাকারী বা বশংবদ বা দাস করে রাখতে হলে, সেই দেশ বা সেই মানুষগুলোর কৃষ্টি ও ধর্ম পরিবর্তন করে দিলেই বাকি কাজ সব হয়ে যায় । ভারতে ইসলামি শাসনের শুরু থেকেই মুসলমান মোল্লা-মৌলবিরা নবাব বা সুলতানদের সক্রিয় সহযোগিতায় সেই কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সেই সুবাদে সম্পূর্ণ ভাবে ভারতে বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলমান ধর্মাবলম্বীর বাস। ব্রিটিশ আমলে ম্যাকলে সাহেব ব্রিটিশ সরকারকে সেই একই উপদেশ দিয়েছিলেন।

আজ ইসলামি শাসন নেই, ব্রিটিশ শাসন নেই। রয়ে গেছে আরবি/তুর্কি সংস্কৃতি, রয়ে গেছে পশ্চিমি ভাবাপন্ন হিন্দুরা এবং বেশ কিছু খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক এবং ধর্মান্তরিত পূর্বতন হিন্দুরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উৎপন্ন আর এক রাজনৈতিক দখলদারিরা সৃষ্টি করলো কমিউনিস্ট নামের মানবতা বিরোধী দল, যারা সম্পূর্ণ ভাবে নাস্তিক। তারাও মেরে কেটে শেষ করে দিল কয়েক কোটি মানুষ এবং এক সময় প্রায় ১০০ কোটি মানুষকে অনুসারী তাদের তৈরি করলো। ২০০০ বছরের কিছু আগে সৃষ্ট খ্রিস্টান এবং ১৫০০ বছর আগে সৃষ্ট ইসলাম আজ পৃথিবীর ৬০০ কোটির মধ্যে প্রায় ৪০০ কোটিতে পৌঁছে গেছে। একের পর এক মহাদেশের মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি ও আস্থা বর্জন করে তাদের পদতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ওই সব দেশের মানুষদের দাস করে রাখা ওদের চিরন্তন পদ্ধতি। খ্রিস্টীয়, ইসলামি ও কমিউনিস্ট এই তিন মতাবলম্বীরা মরুভূমির মতো রুক্ষ, কঠিন। নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের কেউ এদের কাছে সঠিক মানুষ নয়। নিজ নিজ প্রাচীন কৃষ্টি ও ধর্ম পালন পদ্ধতি এদের পছন্দ নয়। একটিই কথা, হয় আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, নইলে মরো। সেই মতো কোটি কোটি মানুষের রক্তে ভেসেছে পৃথিবী।

—ডাঃ মৃণাল কান্তি দেবনাথ,
বারাসাত, দ: ২৪ পরগনা।

মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বয়স কোনো বাধা নয়

সুস্মিতা সেন

বর্তমানে কর্মরতা মহিলাদের বেশি বয়সে বিবাহ ও সন্তান ধারণের বিষয়ে প্রায়ই অনেক রকম মতামত শোনা যায়। বলা হচ্ছে, কর্মরতা নারীদের বিবাহের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলে, বিশ্বে ৭৫ শতাংশ ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আজকের দিনে অবিবাহিতা। বর্তমান সমাজে যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই বিষয়টিকে নিয়ে এই মহিলাদের অভিভাবকরাও বেশ চিন্তিত। নারীর ক্ষমতায়নকে একদিকে যেমন সমর্থন করা হয় তেমনই পুরুষদের চোখ দিয়ে আজও সব কিছু দেখা হয়। সেই প্রচলিত প্রথাকে নস্যাৎ করে নারীরা নিজেদের নানা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটাই হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন।

যুগ যুগ ধরে নারীর শারীরিক সৌন্দর্য,মনন, মেধা অত্যন্ত আলোচনার বিষয়। সমাজ নারীকে মানবেতর অথবা মানবাতীত ভাবতে শিখেছে, মানুষ ভেবেছে কম। এক সময় নারীর রূপ-সৌন্দর্য, শারীরিক সক্ষমতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত করে তার মেধা মননকে অবহেলা করা হয়েছে। এখন মেধা ও মননের উন্নতিকল্পে শারীরিক সৌন্দর্য অবহেলিত। মানব চরিত্রের বিবর্তনের এটি একটি নতুন রূপ , যা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

নারীর মাতৃ রূপের কাছে সব কিছু যেন হারিয়ে যায়। নারী একাধারে মা, স্ত্রী, প্রেমিকা, মেয়ে, বোন ও বন্ধু। নিয়মের শৃঙ্খলায় নিজেকে আবদ্ধ না করতে চাইলেও স্বামী, সংসার ও মাতৃত্বের সুখ অনুভব করাটা প্রায় প্রত্যেক নারীর মনের ইচ্ছা। আজকের প্রজন্মের নারীরা তাদের সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে নেওয়ার জন্য প্রেমের সম্পর্ক, সেই সঙ্গীর সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট ও আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এক কথায় কম্প্যাটিবিলিটি কতটা সেটা যাচাই করার জন্য একই ছাদের নীচে কিছুদিন এক সঙ্গে থেকে তারপর সিদ্ধান্ত নেন তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সারাজীবন

একসঙ্গে থাকবেন কিনা। পশ্চিমি দেশে এটা বহুল প্রচলিত। বিবাহ বিচ্ছেদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এটি একটা সহজ পদ্ধতি। কিছু ভুল পদক্ষেপে বিবাহ বিচ্ছেদ দু'টি মানুষকে শুধু নয়, তাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা তাদের পরিবারকেও সমস্যায় জর্জরিত করে। তাই সঠিক মানুষ পেলে আজকের নারীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুন্দরভাবে সংসার করতে পিছপা হন না।

আজকের দিনের নারীরা নিজেদের নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করেন, তাই হয়তো বিবাহের কোনো বয়স তাঁরা মানেন না। সদ্য যৌবনা তরুণীরা চেষ্টা করেন নিজেদের প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে যে কোনো ধরনের পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করে, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তারপর বিবাহ করতে। লক্ষ্য— পুরুষের চোখে নিজের দর বৃদ্ধি নয়, নিজের চোখে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করা। বহু মহিলা বিবাহ বন্ধনে নিজেদের না বেঁধে আজকাল লিভ-ইন রিলেশনশিপে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন। এই কারণে তাঁরা বিবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না অথবা মাতৃত্বের অনুভূতি পেতে চান না। আজকের নারীরা চায় মন-মানসিকতা বোঝার মতন সঙ্গী। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের পছন্দসই পুরুষও সমাজে বিরল। কথায় বলে নারীর মন বোঝা ভগবানেরও অসাধ্য। তাই বলে কি পুরুষ-নারী মিলে সুখে সংসার করছে না? সুখী দাম্পত্য কি বিরল? সবই কি অশান্ত? তা একদমই নয়। বিরল হলেও এমন পুরুষ আছেন যারা নারীদের মন-মানসিকতা বুঝে তাদের মতো নিজেদের মানসিকতা রাখেন। ভারতে প্রায় ৭০ শতাংশ নানা বয়সি বিবাহিতা মহিলারা গার্হস্থ্য ও পারিবারিক হিংসার শিকার। মানসিক বা শারীরিক অত্যাচারের শিকার।

কর্মরত নারীরা বিবাহ বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চায়, সন্তান সুখ পেতে চায়। একটু বেশি বয়সে বিয়ে মানেই সন্তান-সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়া নয়। সেই জন্যই তাঁরা সারোগেসি, টেস্ট টিউব বেবি, আইভিএফ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সুবিধায় ফার্টিলিটি এক্সপার্টদের দৌলতে শিশুদের জন্ম দিতে ইচ্ছুক। যে নারীরা তাদের মনের মানুষ পায় না তারা অপেক্ষা করেন এবং সেই অপেক্ষায় হয়তো অনেকটা সময় লেগে যায়, যার ফলে তথাকথিত বিবাহের বয়স পেরিয়ে যায়, তাকে অবিবাহিত থাকতে হয় এবং মাতৃ সুখ থেকেও তিনি বঞ্চিত থাকেন। বিদেশে সিঙ্গেল মাদারহুড বহুল প্রচলিত। নানা কারণে বৈজ্ঞানিকভাবে শিশুর জন্মের থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো শিশু জন্মহার যাতে বৃদ্ধি পায়, হ্রাস না পায়— সেই বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন। আমাদের সমাজ এখনো সেই উন্নত মানসিকতার জন্য প্রস্তুত নয়। তাই হয়তো সমাজের রক্ষকরা যৌবনেই নারীর বিবাহ না হলে নারীর কোমলতা কমে যাবে সেই চিন্তায় চিন্তিত।

নারী বা পুরুষ, কেউই জীবনে একা থাকতে চায় না। আমাদের নিজেদের ঘরেই নিত্যদিন যাদের দেখেছি মা, মাসি, পিসি, দিদিমা, ঠাকুরমা, যারা নিজেদের সংসারের সুখের জন্য তাদের মনের ইচ্ছাকে কী অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মেরে ফেলতেন। তাদের দেখে হয়তো আজকের নারীরা, যারা নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তাদের মনের ইচ্ছাকে মেরে ফেলতে চায় না, তাই সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকে। সামাজিক নিয়মের চাপে, বয়সের বাধ্যবাধকতায় বা চক্ষুলজ্জায় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে না নেওয়াটাই হয়তো ঠিক। □

বর্ষায় শিশুর চাই ত্বকের বিশেষ যত্ন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বর্ষাকাল পড়েছে মানেই বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা নাজেহাল। বিশেষ করে খুব ছোটো বাচ্চাদের তো এসময়ে ত্বকের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। একদিকে বৃষ্টি টানা চললেও শিরশিরানি অনুভূতি আবার অন্যদিকে ভ্যাপসা গরমও কিছু ছাড়ছে না। বাচ্চার বয়স দু-তিন বছর হলে বেশি বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা অনুভূতি হওয়াতে তারা স্নান করতে চায় না। আবার বাইরে থেকে এসে ত্বক ঠিকমতো পরিষ্কার না করলে ঘা ও চুলকানি দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এসময়ে বাতাসে ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার বাচ্চাদের নানারকম চর্মরোগ দেখা দেয়। তাই এই সময়টা ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত।

(১) বৃষ্টিতে বাইরের নোংরা জল গায়ে ছিটলে বা পা ডুবলে কিংবা ভিজলে বাড়িতে ফিরে সাবান দিয়ে ভালো করে স্নান করতে হবে। একটু উষ্ণ জলে ডেটল ফেলে পা ধুয়ে নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এই পরিচ্ছন্নতা করা যাবে, ততই শরীরে রোগ-জীবাণু কম বাসা বাধবে। তারপর শুকিয়ে গেলে ট্যালকম পাউডার লাগাতে হবে। বাচ্চাদের হাত ও পায়ের আঙুলের মাঝখানে ভালো করে মুছতে হবে, যাতে একটুও জল না থাকে। এই জল থেকেই ছত্রাকের সমস্যা হয়।

(২) বর্ষাকালে আবহাওয়া স্যাঁতস্যাঁতে থাকায় বাচ্চাদের ঘাম বেশি হয়। স্কুলে বেশিক্ষণ থাকার পর স্কুল থেকে যখন বাড়ি ফেরে তখন জামাকাপড় ঘামে ভিজে তাতে নানা জীবাণু বাসা বাঁধে, যা আমরা উপর থেকে বুঝতে পারি না। তাই এই সময়ে দু'সেট জামাকাপড় রাখাই ভালো স্কুলের জন্য। গেঞ্জি, মোজা ও অন্তর্বাস প্রতিদিন ধুয়ে দেওয়া উচিত। আর কখনওই ভিজে মোজা পরিয়ে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন না। অনেকে হালকা ভেজা মোজা পায়ে গলিয়ে দেয় বাচ্চাদের, ভাবে স্কুলে যেতে যেতে শুকিয়ে যাবে, কিন্তু এই ভুলটা কখনও করবেন না। বরং সারাদিন এমনিতেই ভেজা মোজা পরা, তার ওপর আবার ঘাম জমলে সংক্রমণের দ্বিগুণ সম্ভাবনা থাকে।

(৩) বর্ষায় বড়োদের মতো বাচ্চাদের ত্বকে আরও একটা সমস্যা হয়, যেটা তারা সবসময় বলতে পারে না, আঙুলের ভাঁজে, বগলের নীচে, কুঁচকিতে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়। দাদ, হাজা-র মতো রোগ থেকেই এগুলি হয়। তাই স্নানের সময় এসব জায়গা ভালো করে ধুয়ে শুকনো করে মুছতে হবে। যদি দেখেন জায়গাটা ক্রমশ লালচে হয়ে যাচ্ছে বা ছোটো ছোটো দানা বের হচ্ছে, তাহলে চিকিৎসক দেখান, প্রয়োজনে অ্যান্টি ফাংগাল পাউডার বা ক্রিম লাগাতে হতে পারে। মোটের উপর জায়গাটা শুষ্ক রাখতে হবে।

(৪) যেসব বাচ্চা ডায়াপার পরে তাদের এই সময়ে ডায়াপার থেকে নানাবিধ সমস্যা হতে পারে। কেননা বর্ষার স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় বাচ্চাদের ইউরিন বেশি হয়, আর তা জমে ডায়াপারের নীচের ত্বকে ঘা তৈরি হয়। ডায়াপার পরালে বারে বারে দেখা উচিত, সেটা ভিজে গেছে কী না। বেশি ভিজে গেলে সেটি বদলে দিন। ডায়াপার পরানোর আগে একটু ভেসলিন লাগিয়ে নিলে এই সমস্যার সমাধান হয়।

(৫) বর্ষার আরও একটি কমন চর্মরোগ হলো স্ক্যাবিস। রোগটা খুবই ছোঁয়াচে। স্কুল বা বাড়িতে একজনের হলে বাকি সকলেরও হতে পারে। তাই কারও স্ক্যাবিস হলে উচিত সকলের মধ্যে যাতে তা ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য দ্রুত চিকিৎসা করাতে। এই রোগে মাথা, মুখ, হাত, পায়ের তলা, গলা ইত্যাদিতে নানাবিধ র‍্যাশ বের হয়।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনজাতি সমাজ উত্তরবঙ্গকে সমৃদ্ধ করেছে

ইন্দ্রমোহন রাভা

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও তৎসংলগ্ন তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জনবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। পাহাড়, পর্বত, নদী, ঝরনা, জলজঙ্গল, বনাঞ্চলের সঙ্গে ঢেউ খেলানো দিগন্তবিস্তৃত সবুজ চা-বাগানের অপরূপ দৃশ্য অঞ্চলটিকে অনন্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কম-বেশি ২২টি জনজাতি সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় জীবনশৈলী এই অঞ্চলটিকে নৃতাত্ত্বিক গবেষণাগারে পরিণত করেছে। এই অঞ্চলটি বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মিলন ভূমি। জনজাতি সমাজ সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃতি নির্ভর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত। প্রাকৃতিক শক্তিকেই এরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। এটাই এদের ধর্মচর্চার মূল অধ্যায়। জনজাতি সমাজের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এরাই মূলত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার নানান উপাদান জুগিয়েছে। এরা জন্মগত, প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত ও

রাভা যুবক-যুবতী

বিশ্বাসগতভাবে জনজাতীয় হিন্দু, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবাসী যে বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য গর্ব করে থাকে তার আদি রূপ গড়ে দিয়েছেন জনজাতি সমাজের মানুষেরাই। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ইন্দো-মোঙ্গলীয় শাখার অন্তর্গত কয়েকটি জনজাতিগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

মেচ বা বোড়ো জনজাতিগোষ্ঠী :

মূলত দার্জিলিং ও ভুটান পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চলে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকায় বোড়োরা বসবাস করে। অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে এক সময় এদের রাজত্ব ছিল। নৃতাত্ত্বিক ও

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এরা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতীয় সংবিধানে এদের তপশিলি জনজাতি ভুক্ত করা হয়েছে।

জীবিকা ও পেশা : এদের মূল জীবিকা হলো কৃষি। এছাড়া বিভিন্ন পেশায় এরা নিযুক্ত। পশু পালন, বাগিচা নির্মাণ, হস্তশিল্প চর্চা ইত্যাদি। হস্তশিল্পে এরা অতি দক্ষ। অসমের বিখ্যাত এন্ডি শিল্প এদের অনন্য কীর্তি। বোড়ো সমাজের মেয়েরাই হস্তশিল্প এবং এন্ডি শিল্প বা বস্ত্রবয়ন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের পেশারও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনেকেই চাকরি করেন। অনেকেই পুলিশ, প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন। তাছাড়াও বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসার সঙ্গে এরা যুক্ত রয়েছেন।

ভাষা : এরা নিজেদের মধ্যে বোড়ো ভাষায় কথাবার্তা বলেন। এই ভাষা তিব্বতীয় ব্রহ্ম ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। নিজস্ব কোনো লিপি নেই। এই সমাজের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি সাধারণ লিপি হিসাবে রোমান হরফ, অনেকেই আবার দেবনাগরী হরফ ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এ নিয়ে বোড়োদের মধ্যে দ্বিমত আছে। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর অনেক জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ধারা বজায় থাকলেও বোড়ো সম্প্রদায় কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ধারার অনুসারী। কিন্তু মায়েদের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। মহিলারাই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান : বোড়োদের আদি ও শ্রেষ্ঠ উপাসনাপদ্ধতি হলো— বাথোউ। এদের ধর্মবিশ্বাস মতে বাথোউ বা শিব্রায় এবং দেবী শিব্রুই মিলে এই বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদানকে তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকেন। সেগুলি হলো— মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ (হিন্দু ধর্মের পঞ্চতত্ত্ব)। বাথোউ দেবতার প্রতীক হিসাবে পাঁচটি পাতাযুক্ত সিজু গাছ ধর্মীয় স্থানে পুতে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি খ্রিস্টান মিশনারিরা উত্তর-পূর্ব ভারতের

গারো দম্পতি

পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল ঘেরা জনজাতি সমাজের মধ্যে ব্যাপক ধর্মান্তরণ শুরু করে। বোড়ো জনজাতিগোষ্ঠীও ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হতে থাকে।

উৎসব অনুষ্ঠান : মূলত, ধর্মীয়, কৃষিভিত্তিক ও ঋতুভিত্তিক হয়ে থাকে। পয়লা বৈশাখ থেকে এক সপ্তাহ ধরে এদের বড়ো উৎসব ব্যুইসাগু শুরু হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে খেরি এবং কাত্রি গাসা উৎসব পালিত হয়। ডিসেম্বর মাসে আঙ খাম জানায়। জানুয়ারি মাসে ডোমাসি উৎসব পালিত হয়। যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে এরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে নৃত্য গীত, খাওয়াদাওয়ায় মজে থাকে। শিক্ষা, রাজনীতি এবং গোষ্ঠী চেতনায় এরা খুব বেশি সচেতন।

রাভা জনজাতি : ইন্দো-মোঙ্গলীয় শাখার আরেকটি বিশেষ জনজাতি হলো রাভা জনজাতি। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকায় এরা স্বল্প সংখ্যায় বাস করে। অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং মেঘালয়ের গারো পাহাড় অঞ্চলে বহু সংখ্যক রাভা বসবাস করে। কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে— 'রাভা হাসং অটোনমাস কাউন্সিল' গঠিত হয়েছে, হেড অফিস দুধনই শহর। রাভারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন— কোচা বা কোচ হিসাবে (নাং কোচা)। এরা কোচা ভাষায় কথাবার্তা বলেন (কোচা ক্রোউ)।

আদিতে কোচ হিসাবে পরিচিত থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময় থেকে এই জনগোষ্ঠীকে 'রাভা' বলে অভিহিত করা হয়। যার অর্থ যাদেরকে আহ্বান করে নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এরা 'কোচ' পদবি ব্যবহার করেন। গবেষকদের মতে, কোচবিহার রাজবংশের পূর্বপুরুষ বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ প্রমুখ কোচ রাজা ছিলেন। তারা বৈদিক মতে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং 'নারায়ণ' পদবি গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাভারা তপশিলি ভুক্ত জনজাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থা : রাভা সমাজের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা চালু রয়েছে। মায়েরাই পরিবারের প্রধান হন। মায়েদের গোত্রই সন্তানেরা প্রাপ্ত হয়, সম্পত্তির অধিকারী হয়। আগে বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষকে কনের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হতো ঘরজামাই হিসাবে। সমাজ পরিবর্তনের প্রভাবে এখন অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রাচীন প্রথা বিশেষ চালু নেই। শুধুমাত্র বনাঞ্চল এলাকায় একত্রে বসবাসকারী রাভাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি, আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রচলন দেখা যায়। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী রাভাদের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি ও মিশ্র ভাষার প্রচলন রয়েছে। বৃহত্তম রাজবংশী জনসমাজের সঙ্গে বসবাসের ফলে এদের মধ্যেও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। রাভাদের মধ্যে অনেক গোত্র— হউসুগ (clan) চালু আছে। স্বগোত্রে এদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। রাভারা হউসুগ প্রথা এখনো মেনে চলেন। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অসবর্ণ বিয়ে চালু হয়েছে। ভিন্ন বর্ণের কনেকে অনেক সময় কোনো রাভা রমণী নিজের গোত্র প্রদান করে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন।

জীবিকা ও পেশা : বনাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী রাভারা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কর্মী বা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। বন দপ্তরের দেওয়া জমিতে চাষবাস করে। নিজেদের বাড়িতে নিজেদের তৈরি তাঁতে বস্ত্র বোনে। এছাড়া পশুপালন বিশেষভাবে শূকর পালন ও হাস, মুরগি পালন এদের অন্যতম

জীবিকা। মেয়েরা পচানো চালের সঙ্গে শিকড় বাকর মাখিয়ে ঘরে তৈরি হাড়িয়া মদ তৈরি করে (চকত)। উৎসব অনুষ্ঠানে এই (চকত) পান করা হয়। গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভারা আদিকাল থেকেই কৃষিভিত্তিক জীবনযাপন করে আসছে। বর্তমানে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় তারা নিযুক্ত রয়েছে। রাভাদের অর্থনৈতিক কাঠামো খুবই দুর্বল।

ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান : রাভাদের মুখ্য দেবতা— জগ ঋষি (ঋষি বায়) এবং প্রধান দেবী 'রৌন্তক বায়'। তাছাড়া কামাখ্যা দেবী রাভাদের কাছে অতি জাগ্রতা দেবী। প্রত্যেক রাভা পরিবারে বাড়ির উত্তরপূর্ব কোণে স্থাপিত ধানের মাচা সংলগ্ন পবিত্র স্থানে গৃহদেবী রৌন্তক দেবীর থান পাতা থাকে। বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবারের মায়েরা কিংবা বাড়ির বড়ো গৃহবধূ রৌন্তক পূজা করেন।

নৃত্য-গীত প্রিয় এই জনজাতিরা পূজাপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথক নাচ এবং গান করে থাকে। বিখ্যাত কয়েকটি রাভা নৃত্য হলো— ১. নাক চেং রেনি— চিংড়ি মাছ ধরার নৃত্য। বহু স্থানে এই নৃত্যের জন্য রাভারা সুপরিচিত। ১৯৮৫ সালে ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে সমবেতভাবে এই নৃত্যের জন্য মধ্য কামাখ্যাগুড়ি কোচ রাভা কৃষ্টি পার্টির রাভারা প্রথম পুরস্কার লাভ করে। ২. বসর পৈদান— বসন্ত উৎসবের নাচ। ৩. হান্ডা বারু— যুদ্ধের নাচ। রাভা সমাজের মানুষ নিজেদের পরম্পরাগত ধর্মীয় কৃষ্টিকলা বজায় রেখেও প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে বিশ্বাস রেখেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসমের শ্রীমন্ত শঙ্কর দেব প্রতিষ্ঠিত একশরণ বৈষ্ণবমত এরা অনেকেই মেনে চলেন। উত্তরবঙ্গের রাভারা প্রায় ৮০/৯০ বছর ধরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের রীতিনীতি পালন করে আসছে। তবে, বনাঞ্চলে বসবাসকারী রাভাদের অনেকেই অসম থেকে আগত খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এখনো এই ধর্মান্তরণ চলছে। রাভাদের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অনেক সংস্থা তৈরি হয়েছে। রাভা ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল (আরডিসি) রাভা কৃষ্টি পার্টি, আমায় রৌন্তক সমিতি ইত্যাদি।

টোটো জনজাতি : নৃতাত্ত্বিক ও গবেষকদের মতে ভারতের ক্ষুদ্রতম জনজাতিগোষ্ঠী হলো টোটো জনজাতি। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তরাংশে মাদারিহাট থানার অন্তর্গত ভুটান পাহাড়ের ঢালে তোরসা নদীর পাড়ে বনাঞ্চল ঘেরা এলাকায় এই টোটোদের বাস। বর্তমানে এদের সংখ্যা ১২শোর কাছাকাছি। যতদূর জানা যায় ১৮৮৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের ভূ-সমীক্ষক অধিকর্তা ড. সুন্দর জমি জরিপের কাজ করতে গিয়ে এই জনগোষ্ঠীর দেখা পান। আদিম অধিবাসীদের কথাবার্তা, চেহারা, আচার, ব্যবহার দেখে তিনি কৌতূহলী হয়ে বিশদভাবে খোঁজখবর নেন। প্রাথমিক ভাবে, পার্শ্ববর্তী ভুটিয়াদের সঙ্গে মিল খুঁজে না পাওয়ায় অনেক তথ্য সংগ্রহের পর এই জনগোষ্ঠীকে তিনি স্বতন্ত্র একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিখ্যাত গবেষক ড. চারু চন্দ্র সান্যাল এদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এদেরকে--- 'বিলুপ্তপ্রায় উপজাতি' বলে আখ্যায়িত করেন। অত্যন্ত দরিদ্র ও কর্মসংস্থানহীন টোটো সমাজের মানুষরা আধুনিক জীবনযুদ্ধে ক্রমশ হেরে যাচ্ছে। সরকারি উদাসীনতায় পার্শ্ববর্তী অন্য সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এদের জায়গা জমি দখল করে নিয়েছে। নিজেদের

জমিজমার কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারার কারণে অনেক জমি খাস হয়ে গিয়েছে। ভৌগোলিক কারণে কলেরা, ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকেই প্রাণ হারান। যদিও বর্তমানে সভ্য সমাজের নজরে আসার পরে এবং কিছুটা সচেতনতার কারণে সরকারি সুযোগ-সুবিধা এদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমানে এদের মধ্যে কিছু ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখেছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছে। সম্প্রতি ধনিরাম টোটো পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

জীবিকা ও পেশা : প্রাচীনকাল থেকেই এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে খাদ্য সংগ্রহ, প্রাচীন প্রথায় কৃষিকাজ, পশু পালন, মাছ ধরা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনযাপন করে আসছে। খাদ্য হিসেবে কাউন, ভাত, মাছ, মাংস, বনের কন্দ ইত্যাদি গ্রহণ করে। সব ধরনের মাংস এরা খায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও উৎসব অনুষ্ঠান : চারপাশের প্রাকৃতিক উপাদান, গাছ, লতাপাতা, পাহাড়, পর্বত, পাথর ইত্যাদির মধ্যে এরা ঈশ্বরের শক্তি বা প্রকাশ দেখতে পান। মুখ্য দেবতা হলেন ঈশপা। পুরুষ রূপে ঈশপা'কে সাইঁঝা এবং স্ত্রী রূপে সাইঁঝানি বলে। ঠাকুরঘরকে এরা 'চিমা ঘর' বলে। গৃহ দেবতা হলেন চিমা। প্রতীক হিসেবে ঘরে একটি পিঁড়ি পাতা হয়। তার উপর ঘরে তৈরি মদের হাঁড়ি ও পাত্র রেখে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে আরও কিছু প্রাকৃতিক উপকরণ থাকে। ভূমি থেকে ৬-৭ ফুট উঁচুতে বাঁশ অথবা কাঠের তৈরি মাচান ঘরে এরা বাস করে। বাসস্থানকে নাকেসা বলা হয়। রান্নাঘরকে বলা হয় মারাং। উল্লেখযোগ্য উৎসব হলো ওঁম চু এবং ময়ূ। অনুষ্ঠানের সময় যে ঢোল বাজানো হয় তাকে বাকুঙ্ বলা হয়। টোটোদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে ভয়ংকর অপদেবতা হলো পিদুয়া। এই অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য টোটোরা একে পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করে। তিনটি সাদা মোরগ, লাল কাপড়, চাল, আদা ও মদ দিয়ে পুজা করা হয়। টোটোরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে টোটো ভাষায় কথা বলেন। তবে সামাজিক পরিবেশে সাদরি ভাষা, নেপালি ভাষা ব্যবহার করেন। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা ভাষাও চলে। টোটো সমাজের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অতি নগণ্য। তুলনামূলকভাবে মৃত্যুহার বেশি। কোনো পরিবারে শিশুর জন্ম হলে সারা গ্রাম ঢোল পিটিয়ে আনন্দ উৎসব পালন করে। নৃত্য গীত শুরু করে দেয়। শিশু জন্মানোর পরে শিশুর মা শিশুর মুখে ঘরে তৈরি মদ ছুঁয়ে দেয়। কার্পাস তুলোর মতো পাকিয়ে দূর্বা ঘাসের মালা তৈরি করে শিশুর হাতে পরিয়ে দেয়, যাতে কোনো অশুভ শক্তি শিশুর ক্ষতি করতে না পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সনাতন সংস্কৃতির মধ্যেও এই প্রথা বিদ্যমান।

গারো জনজাতি : উত্তরবঙ্গের ইন্দো-মোঙ্গলীয় আরও একটি জনজাতি গোষ্ঠী হলো গারো সম্প্রদায়। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংখ্যক গারো বাস করেন। গবেষকদের মতে, গারোরাও ইন্দো-মোঙ্গলীয় বৃহৎ বোড়ো জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। ভাষাতাত্ত্বিক মতে, ভোট বর্মীজ ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। নিজেদের পরিচয় দেবার সময় এরা 'আচিক মান্দে' শব্দ ব্যবহার করে। অর্থাৎ পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ। বর্তমানে এদের মূল আবাস মেঘালয়ের গারো পাহাড়ি অঞ্চল। গারোরা মূলত দুটি শাখায় বিভক্ত। সাংবা ও মারাক। রাভা সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের অনেকটা মিল রয়েছে। এদের মধ্যেও গোত্র (চাচ্চি) প্রথা বিদ্যমান। প্রাচীনকাল গোষ্ঠীপতি হিসেবে 'নকমা'রা সমাজ ব্যবস্থা চালাত বা শাসন করতো। এরাই এলাকার জমির অধিকারী ছিল। অনেকটা ছোটো জমিদারের মতো। নকমাদের কাছ থেকে কর দিয়ে কিংবা উৎপন্ন ফসলের ভাগ দিয়ে জমি নিয়ে চাষবাস করতে হতো। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে বনবিভাগের অনুমতি প্রাপ্ত জমিতে গারোরা ঝুম চাষ করত। প্রচলিত শস্য জোয়ার বা ভুট্টা উৎপাদন করেও জীবিকা নির্বাহ করে। কার্পাস চাষে এরা অতি দক্ষ শ্রমিক।

সমাজ ব্যবস্থা : গারোরাও রাভা জনজাতি সম্প্রদায়ের মতো মাতৃতান্ত্রিক। মায়েরা বা মহিলারা পরিবারের প্রধান হন। সন্তানেরা মায়েদের গোত্র প্রাপ্ত হয়। পুরুষরাও পরিবারের মধ্যে সমান অধিকার মর্যাদা নিয়ে থাকেন। পুরুষ-মহিলা একসঙ্গে সব ধরনের কাজকর্ম করেন। পুরুষরা কর্ম করে সম্পত্তি অর্জন করলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বা সম্মতি নিয়ে ভোগ করেন।

জীবিকা ও পেশা : মূলত প্রচলিত কৃষি কাজ ও জুম চাষ গারোদের প্রধান জীবিকা। বর্তমান বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে এরা কাজ করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পেশায় এরা নিযুক্ত রয়েছেন।

প্রধান খাদ্য : ভাত, মাছ, মাংস, শুটকি মাছ। আরও একটি প্রিয় খাবার হলো 'তা বলচু'। নতুন বাঁশের গাজার তরকারি এদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। গারোরা সব ধরনের মাংস খায়। পোশাকের কোনো বাহুল্য নেই। পূর্বপুরুষরা মাথায় পাগড়ি এবং কোমরে অনেকটা লেংটির কাপড় পরতেন। মহিলারা মোটা কাপড়ের থান কাঁধের নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত পড়তেন। শহর এলাকা বা শহরতলি এলাকার শিক্ষিত গারোরা আধুনিক পোশাক আশাক ব্যবহার করেন।

ধর্মীয় বিশ্বাস এবং উৎসব অনুষ্ঠান : এরা বহু দেব-দেবীর পূজা করেন। এদের ধর্মমতকে বলা হয় 'সাংসাবেক'। কৃষির উন্নতিকল্পে 'মিট দে' পূজা করা হয়। এই দেবতার পূজা করতে একটি শূকর, ১৫টি লাল রঙের মোরগ, ঘরে তৈরি মদ লাগে। নীতিনিষ্ঠা সহকারে এই পূজা করা হয়। দেবতার ক্রোধ থেকে বা অনাসৃষ্টি থেকে বাঁচতে, সুস্থ জীবনযাপন কামনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। যেমন, সালরাগ মিট দে, আত্রা মিট দে, কামাক্ষা আগদক মিট দে ইত্যাদি।

বিগত শতাব্দীতে খ্রিস্টান মিশনারিরা গারোদের ব্যাপক হারে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে থাকে। আদি ধর্ম মত অনুসারী গারোদের সংখ্যা অতি নগণ্য। যুগ পরিবর্তনে গারো সমাজে এসেছে অনেক বিবর্তন।

বর্তমানে খ্রিস্টান গারোরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগামী। কনভেন্ট স্কুলের মাধ্যমে এদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার ভীষণ প্রভাব রয়েছে। এদের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী উত্তরবঙ্গকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ■

সাঁওতালি নৃত্যে রয়েছে শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার কৌশল

কল্যাণ গৌতম

১৮৫৫ সালে ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সরল সাধাসিধে অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে বলীয়ান এক ভারতীয় জনজাতি গোষ্ঠী— সাঁওতাল সমাজ। তারা লড়াই করেছিল গোলা- বন্দুকের বিরুদ্ধে, আগ্রাসী প্রবল এক শক্তির বিরুদ্ধে। বীরবিক্রমে সাঁওতাল বীরেরা সেই অসম লড়াই লড়েছিল।

সাঁওতালরা প্রকৃতির সন্তান, ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন অরণ্য- কেন্দ্রিক সভ্যতার এক নান্দনিক সৌকর্যের প্রকাশ। লেপাপোছা কুটির, সুঠাম-সুন্দর দেহসৌষ্ঠব, অরণ্যের নৈকট্য, প্রকৃতির সামীপ্য-সান্নিধ্য তাদের সম্পর্কে অনন্য অনুভূতি নিয়ে আসে। তবুও তাদের জীবনচর্যা, মানসচর্চা, লোকসংস্কৃতি, অরণ্য-সম্পৃক্তি নিয়ে আমরা কতটুকু জানি। সে এক বিস্তৃত আলোচনার পাঠ্য।

প্রস্তুত-আলোচনায় আমরা একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণা করবো। সাঁওতালি শিকার ও রণনৃত্যে কতটা শারীরিক সক্ষমতার প্রকাশ। সাঁওতালরা যে নাচের সংস্কৃতি এখনও জিইয়ে রেখেছেন, তা তিনটি ভাগে বিভক্ত। কিছু নাচ রয়েছে সামাজিক নাচ; যেমন প্রতিযোগিতামূলক 'দং'-নৃত্য যা বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। সামাজিক নাচের মধ্যে 'লাগড়ে'-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় উৎসব ও পালপার্বণে। সামাজিক নাচের মধ্যে আর রয়েছে 'ঝিকা'-নৃত্য যাতে জীবনের দুঃখ-বেদনা-আনন্দরূপের অনন্য প্রকাশ। এছাড়া রয়েছে 'দাঁসায়'-নৃত্য, যা দুর্গাপূজার সময় অনুষ্ঠিত হয়। রয়েছে 'ডাহার'-নৃত্য, যা একান্তই কুমারী-নাচ।

দ্বিতীয় ধরনের যে নাচ, তা হলো ধর্মনৃত্য। যেমন— 'বাহা'-নৃত্য, যা বসন্তকালীন বাহা পরবের সময় পরিবেশিত হয়; 'করম'-নৃত্য, যা বর্ষাকালে করমপূজার সময় পরিবেশিত হয়, 'মাঃ মঁড়ে'-নৃত্য, যা গ্রীষ্মকালে দেবতার ক্রোধ নিবারণের উদ্দেশ্যে মাদলের ছন্দে ছন্দে অনুষ্ঠিত হয়।

নাচের যে তৃতীয় প্রকার, তা হলো শিকার নৃত্য ও যুদ্ধনৃত্য। এর মধ্যেই তাদের সামগ্রিক শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার অনন্য প্রকাশ। এই নৃত্যানুশীলনের মধ্যে তাদের আপন গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও খাদ্য-অন্বেষণের সাফল্য লুকিয়ে থাকে।

শিকার নাচের অন্যতম হলো 'দুঙ্গের', যার আয়োজন ঘটে বনের অভ্যন্তরে, শিকারকে সফল করে তোলার এক মনোযোগের অধ্যয়নে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার সুস্পষ্ট নান্দনিক প্রকাশে। সাঁওতাল পুরুষেরা একে অপরের কাঁধে হাত রেখে, ডাইনে-বামে সরে সরে, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নেচে ওঠে। শিকারের আগে মানসিক প্রস্তুতি। সঙ্গে জনজাতি-বাদ্য বেজে ওঠে 'দেন্ দেন্, দেন্ দেন্...।' এক সুবিস্তৃত অরণ্যভূমি কেঁপে কেঁপে ওঠে সেই বাদ্যে, বনে বনে পশুরা সচকিত হয়ে শুরু করে ছুটোছুটি। আর বনজ সৌন্দর্যের পরতে সাঁওতাল পুরুষের শিরায় শিরায় ছোটে অশান্ত শোণিত; পেশিতে পেশিতে বয়ে যায় তারই রোমাঞ্চ। লড়াই, লড়াই, লড়াই করেই এতকাল খাবার জুটেছে। সেই লড়াইয়ের বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছে সমবেত দৃঢ়তায়, গোষ্ঠী ঐক্যের অনন্ত আভাষে। এই নৃত্যের তালে উদ্ভুত হয় এক বেপরোয়া মনন, আজ খাবার পেতেই হবে। আজ সমবেতভাবে আহার জুটবে।

আর একটি রণনৃত্য হলো 'পাদকন', লাঠি নিয়ে এই দেহসৌষ্ঠবের নাচ। কখনো সেই লাঠি দেহের উপরে উঠে আসছে, কখনও নীচে নেমে আসছে অদ্ভুত কৌশলে। কখনও ঘুরে ঘুরে লাঠি নিয়ে নানান অঙ্গভঙ্গি, কখনও আক্রমণের দৃশ্য, কখনও প্রতি আক্রমণ। পুরো নাচটি জুড়েই সদা সক্রিয়তা, নিরন্তর চোখে চোখ রাখা। এই নৃত্যে আত্মরক্ষার মেজাজটি অনুভূত হয়।

আজ এ সকল নৃত্যের মহড়া হারিয়ে যাচ্ছে জনজাতি জীবন থেকে। কিন্তু জীবনের নানান পথে চলতে গিয়ে, সত্যের জন্য লড়তে গিয়ে তা জীবনবোধ থেকে বাদ দেওয়া চলে না। এইসব নাচ হাজার হাজার বছরের উত্তরাধিকার। এর মধ্যে রয়ে গেছে শরীর গঠনের এক অপরূপ কৌশল। সহজ সরল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের আপন সংস্কৃতি থেকে উৎখাত করে ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া যেখানে আজও জারি আছে, সেখানে এই যুদ্ধ নৃত্য বন্ধ করা কখনই উচিত নয়। তা সমাজকে ভেতর থেকে শক্তি জোগাবে। হে অরণ্যের সন্তান, তোমরা অনন্ত জীবনের দ্যোতক, অসীমকালে প্রসারিত তোমাদের সংগীত ধ্বনি আজও মাদলের তালে তালে ভারতমাতার জয়ধ্বনি করে উঠুক। এই মহান দেশকে রক্ষার জন্য সাঁওতাল বিদ্রোহের পুণ্যপ্রভাত চির-ভাস্বর হয়ে থাকুক। ■

ফঃ ৪

রাজ্যের জনজাতি এবং সাঁওতালি কৃষি সংস্কৃতির পরিচয়

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ব ভারতে সবচেয়ে বড়ো জনজাতি গোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল। তারা জনজাতির মধ্যে মুখ্য বা প্রধান। জনসংখ্যার বিচারে রাজ্যের মাঝারি জনজাতি গোষ্ঠী বলা যেতে পারে ওঁরাও, মুণ্ডা ও ভূমিজ। অন্যান্য ক্ষুদ্র জনজাতি গোষ্ঠীগুলি হলো কোড়া, লোধা, মাহালি, ভুটিয়া, বেদিয়া ও শবর। এর মধ্যে ভুটিয়া ছাড়া বাকি নয়টি গোষ্ঠীর মূল বসবাস দক্ষিণবঙ্গ বা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ। ভুটিয়া সমাজের অবস্থান উত্তরবঙ্গে। তবে পশ্চিমাঞ্চলের জনজাতি গোষ্ঠীর অনেকে উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে অভিবাসিত হয়ে গেছে ব্রিটিশ আমলে।

পূর্বতন পশ্চিম মেদিনীপুরে (বর্তমানের ঝাড়গ্রাম জেলা-সহ) জনজাতির সংখ্যা সবচাইতে বেশি, তার পরই অখণ্ড জলপাইগুড়ির স্থান। দক্ষিণবঙ্গের অখণ্ড পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় আনুমানিক ৪০ শতাংশ জনজাতির বসবাস যারা ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড়ীয় (যেমন ওঁরাও)। উত্তরের জেলাগুলিতে সম্মিলিতভাবে জনজাতি আনুমানিক ৩৩ শতাংশ বসবাস করে। এর মধ্যে অভিবাসিত জনগোষ্ঠী ছাড়া বাকিরা ভোট-চিনীয়, ভোট-বর্মী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত যেমন মেচ, রাভা, গারো, ভুটিয়া, লেপচা, টোটো।

জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা কৃষি নির্ভর। কেউ নিজের জমিতে চাষ করে, কেউ অন্যের জমিতে মজুর হিসাবে কাজ করে। চাষের মরসুমে এদের অনেকে নানান জায়গায় গায়েগতরে ‘পুব খাটতে’ যায় এবং অর্থ উপার্জন করে। পাহাড়ি গারো, টোটো সমাজের মানুষ ঝুমচাষের মতো স্থানান্তর কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার কোনো কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ লোকশিল্পী হিসেবে বিবিধ সামগ্রী বানিয়ে তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে, যেমন চিক বরাইক, অসুর, মাহালি, বীরহোড়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে তারা বনের ফল-মূল, বন্যসবজি, পশু-পাখি, বুনো শিকড়, কন্দ, পাতা— এসব খেয়েই জীবনধারণ করতো। সমতলভূমিতে বিছিয়ে থাকতো শ্যামাঘাস, তার দানা সংগ্রহ করতো। কখনও এই ঘাস ও খেসারির ডাল নিজেরাই বনের বাইরে চাষ করে নিতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সাঁওতালরা হয়ে গেল ভাগচাষি। চাষের প্রযুক্তি বা কৃষি সংস্কৃতি সেই সময় থেকেই গড়ে ওঠে, পাশাপাশি কৃষিজীবন শুরু হয়। সাঁওতাল সমাজের কৃষিকথার প্রমাণ রয়েছে রামদাস টুডু রেস্কা প্রণীত ‘খেরওয়াল বংশা রমপুঁথি’ গ্রন্থে। সাঁওতাল সমাজের কৃষি সংস্কৃতির কিছুটা ঐতিহ্যের অনুবর্তনে এসেছে আর কিছুটা ‘ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড’-এ অর্জিত জ্ঞান।

বর্তমানে তারা অল্পজলে সার হিসাবে জলজ ফার্ন জন্মিয়ে কৃষিক্ষেত্রে এবং মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। জমিতে জো দেবার পূর্বে আগাছা উপড়ে না ফেলে গোখাদ্য হিসেবে কিছুটা এবং বাকি জৈবসার হিসেবে জমিতে মিশিয়ে দেয়। বহু আগাছার ভেষজগুণ তারা জানে এবং ব্যবহার করে, যেমন ধাতুরোগে জিয়ান লতা, যকৃতের সমস্যায় সাজি শাক, শিশুর পুষ্টির জন্য কাঁথা শাক, বলদের ক্ষত রোগের চিকিৎসায় শাল মঞ্জরীর বাটা, মানুষের ফোড়া ও ব্রণের উপশমে ‘কটকী’ গুল্মের বাটা, আমাশয়ে খেতের পাশে উৎপন্ন থানকুনি ইত্যাদি। তারা কৃষি লোকাচার অনুসরণ করে। তাতে সংযুক্ত হয় বসন্তের শুরুতে ঝরে পড়া মহুয়াফুল, পাকা মহুয়া ফল বা কচড়া। মহুলের তৈরি লোকপানীয় প্রথম উৎসর্গিত হয় সূর্যদেবতা মারাংবুরুকে।

সাঁওতাল সমাজের কৃষিবর্ষ শুরু মাঘমাস থেকে। পয়লা মাঘ পালিত হয় ‘মাঘসিম’ উৎসব। মোরগ বলি, খিচুড়ি রান্না হয়। ভালো বর্ষণের প্রার্থনা জানায়, যাতে সামনে ভালো চাষ হতে পারে। দোল পূর্ণিমায় বনভূমিকে শ্রদ্ধা জানাতে শালুই পূজা করে। বনচারী জীবনের স্মৃতিচারণ করে শিকার উৎসব পালন করে।

বন থেকে সংগ্রহ করে শালপাতা, কাঠকুটো, পিঁপড়ের ডিম, মধু, মহুয়া, ফলমূল, পান, খাদ্যযোগ্য মাশরুম। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে মেতে ওঠে করমপূজায়। কার্তিকের দীপান্বিতা অমাবস্যায় বাঁধনা পরব অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে গোয়ালপূজা, ‘গোরু খোটান’। একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ‘সহরায়’, যার মূল ভাবনা পশুবন্দনা। একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব ‘দাঁশায়’। প্রতিটি উৎসবেই অনুষ্ঠিত হয় নাচ-গান। তার বিষয়বস্তু বৃষ্টি, ফসল, কীটশত্রু, লোকায়তিক কৃষি প্রযুক্তির কথা।

(কৃতজ্ঞতা : ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়)

তথ্যসূত্র : ১. বাংলার সাঁওতালি কৃষিসংস্কৃতি, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২৩, কবিতিকা, মেদিনীপুর। ২. প্রসঙ্গ আদিবাসী, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৪, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে জলসত্র

বনগাঁ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে বনগাঁ পোস্ট অফিস রোডে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিজস্ব ভবনের সামনে খোলা হয়েছে একটি জলসত্র। তীব্র দাবদাহে পথ চলতি সাধারণ মানুষের তৃষ্ণার সময় তাদের হাতে জল ও বাতাসা তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অসংখ্য পথ চলতি মানুষ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তরফে তৃষ্ণার্ত মানুষকে জলদানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পাশেই বনগাঁর একটি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়— বনগাঁ হাইস্কুল। আশ্রমের পাশেই পোস্ট অফিস এবং মহকুমা শাসকের অফিস ও বনগাঁ মহকুমা আদালত। ফলে এই রাস্তায় অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। তীব্র দাবদাহে মানুষকে যখন তৃষ্ণা নিবারণে পয়সা খরচ করে জল কিনে খেতে হয়, সেই পরিস্থিতিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে সেবার মধ্য দিয়ে আন্তরিক বন্ধনে যুক্ত করে চলেছে। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই জলসত্র খোলা থাকে। গত পয়লা বৈশাখ থেকে এই শুভ উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। তীব্র দাবদাহ যতদিন চলবে, ততদিন পথ চলতি সাধারণ মানুষকে পরিশ্রুত পানীয় জল ও বাতাসা দেওয়ার কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী অঙ্গিরানন্দজী মহারাজ। বনগাঁর অন্যতম সমাজসেবী সন্তু শিকদার জানিয়েছেন যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দেশের মানুষের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ একটি সামাজিক-আধ্যাত্মিক সংগঠন। নিঃস্বার্থভাবে দেশের মানুষের সেবা করে যেতে এই সঙ্ঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বনগাঁ শাখা সাধারণ মানুষের স্বার্থে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সময়ে যখন চিকিৎসা— সেবা থেকে পরিষেবাতে পরিবর্তিত হয়েছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে সেবার নৈতিক দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সাধারণ মানুষের চিকিৎসাকে 'সেবা' হিসেবেই বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ ও বদ্ধপরিকর।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সঙ্ঘের ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সঙ্ঘের দুই দিন ব্যাপী ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন আগরতলা-স্থিত নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩-১৪ জুলাই— দুই দিনের সম্মেলনে রাজ্যের আটটি জেলা এবং ২৩টি মহকুমার বিভিন্ন প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। সম্মেলনে বিএমএসের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মহেন্দ্র প্রতাপ সিংহ এবং রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিপিন ডোগরা ও বিষ্ণুপ্রসাদ ভার্মা সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুই দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে বিএমএস রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলই, আর কে কে এমএলের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দেব ও সুতপা কর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিষ্ণু দেব বর্মন বলেন যে সংগঠনের লক্ষ্যই হলো রাষ্ট্রের প্রগতি সাধন। সম্মেলনের প্রথম দিনে একটি সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনের ওপর বক্তারা বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিএমএস ত্রিপুরা রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলইয়ের বক্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। তিনি রাজ্যের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি আরও বলেন যে সংগঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্যের কল্যাণ সাধনে আমাদের সকলের ব্রতী হওয়া উচিত। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। সভাপতি হিসেবে পার্থ পাল, সম্পাদক হিসেবে অভিজিৎ বিশ্বাস এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রঞ্জন পাল নিযুক্ত হন।

দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে শ্রী অনির্বাণ স্মারক বক্তৃতা

গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় শ্রী অনির্বাণ-হৈমবতী ট্রাস্ট ও দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের যৌথ উদ্যোগে দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের শিবানন্দ হলে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম 'শ্রী অনির্বাণ স্মারক' বক্তৃতা। তান্ত্রিক যোগী নিগমানন্দ সরস্বতীর কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী শ্রী অনির্বাণ ছিলেন একজন বেদজ্ঞ পুরুষ। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে বেদ ও মীমাংসা নিয়ে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর রচিত 'বেদ মীমাংসা', 'অন্তর্যোগ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মহান উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যায়। ঋষি অরবিন্দের বৈদিক চেতনায় উদ্ভাসিত, বেদ-উপনিষদ-শ্রীমদ্ভগদ্গীতাকে ভিত্তি করে একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা শ্রী অনির্বাণ রবীন্দ্র পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছিলেন। এদিন শ্রী অনির্বাণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অপালা বসু (সেন)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। সঞ্চালনায় ছিলেন ড. প্রবীর কুমার রায়। শ্রী অনির্বাণ স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল— 'আমি'র কথায় শ্রী অনির্বাণ। বক্তা— সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার বেদান্তের অধ্যাপক কিঙ্কর সামানন্দ (ড. লোকনাথ চক্রবর্তী)। শ্রী অনির্বাণ স্মারক বক্তৃতার বিষয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা তিনি উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যে সার্বিক ভাবে প্রতিভাত হয় শ্রী অনির্বাণের দৃষ্টিতে, ভাষ্যে ও উপলব্ধিতে বেদ-বেদান্ত ও গীতায় বর্ণিত 'আমি'র রূপ ও তার চরিত্রগত ব্যাখ্যা। স্মারক বক্তৃতা শেষ হলে স্বামী সুপর্ণানন্দজী সভাপতির ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণ শেষের পর এই সভার সঞ্চালক ড. প্রবীর কুমার রায় সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত সমাপ্তি সংগীত 'আমি নমি হে তোমায় নমি'-র পর অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

সিউড়ীতে 'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

গত ১৪ জুলাই বীরভূমের সিউড়ীর কেন্দুয়া নিবাসী ও সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ১৫১তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংস্থার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে পূজন করেন তাঁর পুত্রবধূ সোমা চট্টোপাধ্যায়। মাল্যদান করেন সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হাতে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু, অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত রায়, মহাদেব চন্দ্র, আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সহযোগিতায় সুজাতা বিষ্ণু। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক তপন গোস্বামী। কবিতা পাঠ করেন অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত বসু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana ®
SAREES ● SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ত্রিপুরায় খার্চি পূজা
জাতি-উপজাতির মেলবন্ধন

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমক ভাবে পুরাতন আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে খার্চি পূজা, সঙ্গে পূজিত হবেন চতুর্দশ দেবতা। আবারও দেখা যাবে জাতি-উপজাতির আত্মিক মেলবন্ধন। খার্চি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, খার ও চি। 'খার' কথার অর্থ হলো 'পাপ' এবং 'চি' কথার অর্থ হলো 'পরিষ্কার' বা মোচন করা। এক কথায় পাপ মোচন করা। এটি ত্রিপুরী রাজবংশের দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা। পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর জুলাই বা আগস্ট মাসে পুরাতন আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি পৃথিবীমাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পালিত হয়ে আসছে। পূজায় পৃথিবীকে তার অসীম কৃপার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। এই পূজা যথাযথ পবিত্রতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি ত্রিপুরী জনগণের রাজবংশীয় চৌদ্দ দেবতার পূজা বলে পরিচিত। ত্রিপুরার জনজাতিদের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসবও বটে। এই উৎসব প্রতি বছর জুলাই মাসে শুক্লপক্ষ অষ্টমীর চন্দ্রাতিথিতে শুরু হয়।

উৎসবটি ত্রিপুরায় অনাড়ম্বর ভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। পুরাতন আগরতলার চৌদ্দ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক কিংবদন্তি জড়ানো খার্চি পূজায় হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মান্যতা দিয়ে উপজাতীয় বংশোদ্ভূত চন্তাইয়ের সদস্যরা এই পূজা জাঁকজমক ও মহাধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত করে থাকে। স্থানীয় নদীতে বিগ্রহগুলিকে পবিত্র জলে স্নান করানোর পরে মন্দিরে ফিরিয়ে এনে পূজা, ফুল ও সিঁদুর নিবেদন করে মন্দিরে স্থাপন করা হয়। পশুবলিও এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। বলির অঙ্গ হিসেবে ছাগল, মহিষ ও কবুতর বলি দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকে আবার বলির মাধ্যমে মানত পূর্ণ করে। ভক্তরা মিষ্টি এবং বলির মাংস দেবতাদের নিবেদন করে। এই সময়ে একটি বৃহৎ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি জাতি ও উপজাতির মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে।

উৎসবের পিছনে পৌরাণিক কাহিনি মতে এই সময়ে পৃথিবী মা বা দেবী ঋতুস্রাব করেন, যাকে বলা হয় 'আমা পেচি' বা 'অম্বু বাচী'। মাতৃদেবীর রজস্বলার সময় পৃথিবী অপবিত্র বলে বিবেচিত হওয়ায় এই দিনগুলিতে মাটি চাষ করা হয় না। ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার পর পৃথিবী পরিষ্কার করার জন্য খারচি পূজা করা হয়।

ইতিহাসবেত্তাদের মতে, খার্চি উৎসবের ইতিহাস ৫০০০ বছরেরও বেশি পুরানো। আবার কেউ কেউ ৩০০০ বছরের বেশি পুরানো বলে মনে করেন। মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ সনে ত্রিপুরার রাজধানী নিরাপত্তাজনিত কারণে উদয়পুর তথা রাঙামাটি থেকে সরিয়ে আনেন। মহারাজা ধন্যমাণিক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কুলদেবী ত্রিপুরেশ্বরীকে উদয়পুরে রেখে দিলেও মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য চতুর্দশ দেবতাদের নিয়ে এলেন পুরানো হাবেলিতে। চৌদ্দ দেবতা মন্দিরের অষ্টধাতুর নির্মিত এই দেব-দেবীরা হলেন হর (শঙ্কর), উমা (শঙ্করী), হরি (বিষ্ণু), মা (লক্ষ্মী), বাণী (সরস্বতী), কুমার (কার্তিকেয়), গণপা (গণেশ), বিধি (ব্রহ্মা), ক্ষ্মা (পৃথিবী), অব্ধি (সমুদ্র), ভাগীরথী (গঙ্গা), শিখি (অগ্নি), কামদেব (প্রদ্যুম্ন) ও হিমাদ্রি (হিমালয় পর্বত)।

খার্চি পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব চলাকালীন উৎসবের অংশ হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণ মেলা বসে থাকে। মেলায় শত শত দোকান। স্টলগুলিতে বিক্রির জন্য স্থানীয় হস্তনির্মিত পণ্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। রাজ্যের আশপাশের বনবাসী এবং অ-উপজাতিদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনের জন্য একটি বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়। উৎসবে বাঁশ, বেত দিয়ে তৈরি আসবাবপত্রের এবং বিভিন্ন কারুকাজ খচিত উপজাতি বস্ত্রের প্রদর্শনীর জন্যও এই উৎসব বহুল পরিচিত।

খার্চি পূজায় মানুষ তাদের নিজের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রহিতে কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে থাকে। খার্চি পূজা হলো পৃথিবীমাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম। 'খার্চি পূজা' করেন চন্তাইরাজা। পূজার এই কয়দিন চন্তাইরাজা রাজন্য শাসনকালে রাজার সমতুল মর্যাদা পেতেন বলেই চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক 'চন্তাইরাজা' নামে অভিহিত হন। তাঁকে পূজার কাজে সাহায্য করার জন্য থাকেন আচাই, দেওড়াই, নারান, গালিম, বারিফাং, খাফাং, ভাণ্ডিয়া, ইয়াছুক প্রমুখ নামধারী একদল সহকারী।

চন্তাইরাজা বা প্রধান পুরোহিত গোলাপি রঙের জরি বসানো পাঞ্জাবি, সাদা বা সোনালি পায়জামা পরে, কোমরে ওড়না জাতীয় কোমরবন্ধ পরিধান করেন। তাঁর মাথায় থাকে রাজার মতো পাগড়ি। সহকারীদের পোশাক সাধারণ মানের গেরুয়া ধুতি।

জানা যায়, একদিন মহারানি হীরাবতী স্নান করে প্রাসাদে ফেরার পথে দেখেন এক ভয়ংকর মহিষের ভয়ে চৌদ্দজন দেব-দেবী গাছের শাখায় বসে কাঁপছেন। মহারানিকে দেখেই তারা অভয় পেলেন। দেবতারা মিনতি জানিয়ে মহারানির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের রক্ষা করতে মিনতি জানান। একই সঙ্গে তাঁরা রক্ষার উপায়ও বলে দিলেন। তারা বলেন মহারানি যদি নিজের 'রিয়া' তথা বক্ষবন্ধনীটি মহিষের গায়ে ছুঁড়ে দেন তাহলে মহিষ বশীভূত হবে। দেবগণের কথায় মহারানি তাই করলেন। দেব-দেবীরা রক্ষা পেলেন। তারপর চৌদ্দজন দেব-দেবী মহারানির নিকট অনুরোধ করেন যে— তাঁরা মহারানীর প্রাসাদেই বিশ্রাম করবেন আর ওই বশীভূত মহিষের বলির রক্তে তৃপ্ত হবেন। মহারানি তাদের মধ্যে মহেশ্বর আছেন জেনে এই আবেদনকে আদেশ রূপে গণ্য করে সকলকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে কুলদেব-দেবীর মর্যাদায় পূজা করলেন। সেই থেকে ত্রিপুরী বংশীয় রাজগণ কর্তৃক চতুর্দশ দেবতার পূজার সূচনা হয়।

ত্রিপুরী বংশীয় রাজা ত্রিলোচনের দুই পুত্র। দৃকপতি ও সুদক্ষিণ। সুদক্ষিণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা বিতাড়িত হলে পার্বত্য ত্রিপুরার উত্তরাংশে রাজধানী করে রাজত্ব শুরু করেন। প্রথম রাজধানীর নাম খলংমা, পরবর্তী রাজধানীর নাম ছাম্বুলনগর। তিনি চতুর্দশ দেব-দেবীর মূর্তি ত্রিপুরায় নিয়ে এসে পূজার ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁরই বংশধর যুঝারফা দশম শতক নাগাদ রাঙামাটির (বর্তমান উদয়পুর) মগরাজাকে পরাজিত করে নতুন রাজধানী গড়ে চতুর্দশ দেবতার মন্দির গড়েন। সেটি এখনো মহাদেববাড়ি মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে বিগ্রহশূন্য অবস্থায় বিদ্যমান। ১১৭০ সালে উপর্যুপরি বৈদেশিক হানায় তিতিবিরক্ত হয়ে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য রাজধানী নিয়ে এলেন খয়েরপুর অঞ্চলে, নাম দিলেন পুরান হাবেলি বা পুরাতন আগরতলা। রাজপ্রাসাদ গড়ে তার সামনে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের আদলে ইন্দো-মোঙ্গলিয়ান শিল্পরীতিতে, বঙ্গীয় স্থাপত্য ধারায় চতুর্দশ দেবতার মন্দির গড়েন। খনন করা হয় পুণ্যিপুকুর। গৈরিক বর্ণের এই মন্দিরে চতুর্দশ দেব-দেবীর মুণ্ডমূর্তিগুলি পরম ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গে রইলেন পূর্বাপর চতুর্দশ দেবতার প্রতীক রূপে চৌদ্দটি বাঁশের খণ্ড। মূর্তিগুলির মুখমণ্ডল প্রায় একই রকম বলে পৃথক ভাবে কোনো ধ্যানমন্ত্র নেই। তবে সকলের উদ্দেশে উচ্চার্য গুপ্তমন্ত্র আছে ত্রিপুরী ভাষায়। মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পের দৃষ্টিকোণে খুবই আকর্ষণীয়! টিকালো নাসিকা, আয়তচক্ষু গুপ্ত ও পালযুগীয় শিল্প ধারার অনুসারী। মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার দুটি শৃঙ্গ জনজাতিদের আদি ধর্মের ভাবব্যঞ্জনায় সুশোভন। এগুলো শক্তিমত্তারও প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়। কারও কারও মতে এগুলো চন্দ্রবংশীয় ত্রিপুরাধীপতিগণের রাজপ্রতীক চন্দ্রধ্বজাস্থিত চন্দ্রকলার প্রতিরূপ।

খার্চি পূজায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্দিরের দক্ষিণ পাশের প্রকোষ্ঠে নারায়ণ শিলা নিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও পূজা করেন লক্ষ্মী-নারায়ণের। সে সময়ে চণ্ডীপাঠও হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় এই দেবতাদের কাঠামো দেহহীন। দেহহীন হওয়ার পেছনে একটি ব্যাখ্যা হলো হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে কেউ কেউ 'নিরাকার' হিসেবে পূজা করেন, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন মূর্তি ও মূর্তির পূজা করে সাকারের পথ অনুসরণ করেন। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ঈশ্বর যেহেতু একটি ঐশ্বরিক শক্তি, তাই তিনি নিরাকার এবং অদৃশ্য।

অনেক আবর্তন, পরিবর্তন হলেও আজও খার্চি পূজা ত্রিপুরার একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই চিহ্নিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু চৌদ্দ দেবতা মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনেই আসীন রয়েছেন।□

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

দীপক খাঁ

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজেই আছেন। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিসাধনা শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। তাঁদের দু'জনের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতার সঙ্গে মণি মল্লিকের বাড়িতে ব্রাহ্মোৎসবে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সেদিন মল্লিক বাড়িতে আসেন।

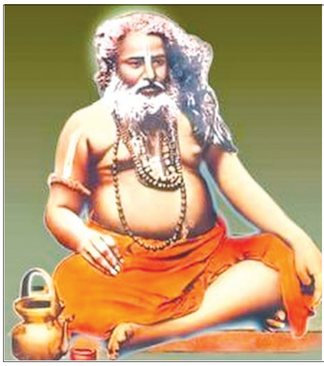

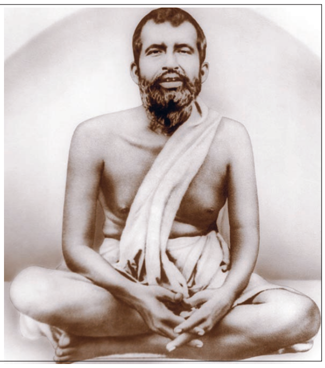

একজন কথক প্রহ্লাদচরিত শোনাচ্ছেন। একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ ও তার ভক্তদের উদ্দেশে বলেন, ভক্তিই সার। তাঁর নামকীর্তন সর্বদা করতে করতে ভক্তিলাভ হয়। এরকম মনে করা ভালো নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। অনন্ত পথ, অনন্ত মত। ঈশ্বর অবাঙ্‌মানসগোচর হলেও বুদ্ধির গোচর। শুধু বিষয়াসক্ত মানুষের অগোচর। গুরুর উপদেশে চিত্তশুদ্ধি হলে ঈশ্বর দর্শন হতে পারে। তাঁর দর্শনের পর, তাঁর আদেশ পেলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে বললেন—"আচ্ছা, তোমরা অতো পাপী পাপী বলো কেন? একশোবার 'আমি পাপী, আমি পাপী' বললে তাই হয়ে যায়। এখন বিশ্বাস করা চাই যে, আমি নাম করছি— আমার আবার পাপ কী? তাঁকে বলো যে, পাপ করেছি, আর কখনও করব না। তাঁর নামে সকলে দেহ, মন, পবিত্র করো— জিহ্বাকে পবিত্র করো"।

বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মবাদী। তিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। পৌত্তলিকতা স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মসমাজের হয়ে ধর্মপ্রচার করেন, উপদেশ দেন। কিন্তু পরমবৈষ্ণব অদ্বৈত গোস্বামীর দশম পুরুষ হওয়ায় তাঁর শোণিতে সুপ্ত ভক্তিধারা তখনও প্রবহমান। বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসী হয়েও ভক্তিভাবের বিরোধী ছিলেন না। ফলে মহাভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ হরিপ্রেমে মাতোয়ারাভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বদ্ধ জীবের বর্ণনা প্রসঙ্গে : 'বদ্ধ জীবের, সংসারী জীবের, কোনো মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত বিপদে পড়ে তবু চৈতন্য হয় না'। উঠের উদাহরণ সহযোগে— 'মুখ দিয়ে রক্ত পড়লেও উটের কাঁটা গাছ খাওয়া বন্ধ হয় না।'

বদ্ধ সংসারী জীব প্রসঙ্গে : 'বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। এতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, তাহলে যে মরে যাবে।'

বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করেন— বদ্ধ জীবের মনের কী অবস্থা হলে মুক্তি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ--- ঈশ্বরের কৃপাতে তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি ব্যাকুলতাই তীব্র বৈরাগ্য। 'খুব রোক না হলে চাচার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।'

বিজয়কৃষ্ণ— এখানে আসবার খুব ইচ্ছা। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্বীকার করেছি।

বিজয়কৃষ্ণকে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ--- আগে অত আসতে। এখন আসো না কেন?

রামকৃষ্ণ--- কামিনী কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনীর জন্যই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মতো কাজ করতে পারো না। তুমি মাঝে মাঝে এসো। তোমাকে দেখতে বড়ো ইচ্ছা করে।

বিজয়কৃষ্ণ— ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে হয়। তাই সদাসর্বদা আসতে পারি না। সুবিধা হলে আসবো।

রামকৃষ্ণ— দেখো, আচার্যের কাজ বড়ো কঠিন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না। সে উপদেশের কোনো শক্তি নেই। আগে সাধন করে বা যে কোনো রূপে হোক ঈশ্বরকে লাভ করতে হয়। তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য হওয়া যায় ও লেকচার দেওয়া যায়।

বিজয়কৃষ্ণ— মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কী লোকের পরিত্রাণ হয় না?

রামকৃষ্ণ— মানুষের কী সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে? যাঁর ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে যুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নেই। যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কী সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে। পরে উদাহরণ সহযোগে বলেন— একদিন ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, শুনলুম একটা ব্যাং খুব ডাকছে। উঁকি মেরে দেখলুম একটা ঢোঁড়ায় ব্যাংটাকে ধরেছে। ছাড়তেও পাচ্ছে না, গিলতেও পাচ্ছে না। তখন ভাবলুম যদি জাতসাপে ধরত, তিন ডাকের পর ব্যাংটা চুপ হয়ে যেত। যদি সদগুরু হয় তাহলে জীবের যন্ত্রণা তিন ডাকে ঘোঁচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘোঁচে

না, সংসারবন্ধনও আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

বিজয়কৃষ্ণ— মহাশয়, কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না?

রামকৃষ্ণ— জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'— যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা'— এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়েই গেল। কিন্তু এই মায়া বা অহংকার তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে। আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে। মনের সচরাচর বাস তিন ভূমিতে— লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি—সেই তিন ভূমি। তখন মনের আসক্তি। আসক্তি কেবল সংসারে— কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতি দর্শন করে বলে 'একি, একি! তারপর কণ্ঠ। যেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করে। কপালে ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন, স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। সপ্তম ভূমিতে যখন মন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।

বিজয়কৃষ্ণ— যেখানে পৌঁছিবার পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কী দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ— সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছালে কী হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেছিল। কিন্তু যেই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর কে বলে দেবে? যে দেবে সেই মিশে গেছে। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই আমি মাঝখানে আছি বলে। জলের ওপরে যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুত এক জল। লাঠিটার দরুন দুটো দেখাচ্ছে। অহং এই লাঠি। বজ্জাত আমি কে? যে আমি বলে— আমায় জানো না। আমার এত টাকা। আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরি করে থাকে। প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপরে চোরকে খুব মারে। পাহারাওয়ালাকে ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। 'বজ্জাত আমি' বলে জানো না, আমার দশ টাকা নিয়েছে। এত বড়ো আস্পর্ধা!

বিজয়কৃষ্ণ— যদি অহং না যায়, সংসারে আসক্তি যাবে না। সমাধি হবে না। তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভালো। যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে, তবে জ্ঞানযোগই ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ— দু'একটি লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার করো, অহং ঘুরে ফিরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার ফেকড়ি বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' না যায়, তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস। 'আমি দাস', আমি ভক্ত, এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই। মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিযোগের কথা বলিতেছেন। জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। দেহ বুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ— দেহাত্ম বুদ্ধি, অহং বুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তির পথ— সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম, গুণগান করো, প্রার্থনা করো। ভগবানকে লাভ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিজয়কৃষ্ণ— আপনি 'বজ্জাত আমি' ত্যাগ করতে বলছেন, 'দাস আমি'তে দোষ নাই?

রামকৃষ্ণ— এই অভিমান। এতে দোষ নাই বরং ঈশ্বর লাভ হয়।

বিজয়কৃষ্ণ— আচ্ছা, যার 'দাস আমি' তার কাম-ক্রোধাদি কীরূপ?

রামকৃষ্ণ— ঠিক ভাব যদি হয়, তাহলে কাম-ক্রোধের কেবল আকারমাত্র থাকে। ঈশ্বর লাভের পর দাস আমি বা ভক্তের আমি থাকে, সে ব্যক্তি কারও অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁওয়ার পর তরবারি সোনা হয়ে যায়, তরবারির আকার থাকে, কিন্তু কারও হিংসা করে না। ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস', তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা— এই অভিমান রাখতে হয়।

বিজয়কৃষ্ণ—যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

রামকৃষ্ণ— হ্যাঁ, বিচারের পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই বলে জ্ঞানযোগ। বিচারপথ বড়োই কঠিন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা— এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? কাজেই তিনি সেবক বা ভক্তভাব ভালোবাসেন। আমি বলি তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস। প্রেমভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। আরও একরকম ভক্তি আছে। তাঁর নাম বৈধী ভক্তি। এতে জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে। এত উপাচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে— এসব বৈধী ভক্তি। এসব অনেক করতে করতে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বর লাভ হবে না।

বিজয়কৃষ্ণ— মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলে, ভক্তি হলেই হয়?

রামকৃষ্ণ— হ্যাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়। কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমভক্তি, রাগভক্তি চাই। যেমন ছেলের উপর মায়ের ভালোবাসা, ছেলের মায়ের প্রতি ভালোবাসা, স্ত্রীর স্বামীর ওপর ভালোবাসা। তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে— 'প্রভু বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।' এবার শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর ভক্তি সাধনার নির্যাস শ্রবণ করালেন। বললেন— এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালোবাসা যদি একবার হয়, তাহলে সাকার-নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।

বিজয়কৃষ্ণ— ঈশ্বর দর্শন কেমন করে হয়?

রামকৃষ্ণ— চিত্ত শুদ্ধি না হলে হয় না।

'হে ঈশ্বর আর এমন করবো না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা হলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বকপাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করো, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না।

ঠাকুর বললেন যে— তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়— 'ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের ওপর একবার ধরো, আমি তোমার দর্শন করি।' □

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জনসঙ্ঘের মেদিনীপুর ও তার উত্তরাধিকার

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

এক দেশ এক আইন, এক সংবিধান, এক প্রধান, এক নিশানের প্রতিজ্ঞা-আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্বাধীন ভারতে প্রাণ দিলেন 'ভারত কেশরী' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। সেটা ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন। মাত্র ৫১ বছর বয়সে নিভে যাওয়া সেই জীবনদীপ স্বাধীন ভারতের মাটিতে এক নতুন প্রতিজ্ঞার নিশান উড়িয়েছিল— ভবিষ্যতের 'ভারতীয় জনতা পার্টি'। জম্মু- কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির দাবিতে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুর অন্ধকার ভবিষ্যৎ তৈরির নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতায় এর আগেই ছেড়েছিলেন জওহরলাল মন্ত্রীসভার মন্ত্রিত্বের পদ। লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের হিন্দু পরম্পরা ও সংস্কৃতি রক্ষা এবং জওহরলালের রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমান তোষণের বিরোধিতা। প্রতিজ্ঞা ছিল সর্ব-ধর্ম সমভাবের এই ভারতবর্ষকে হিন্দুদের নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলা। 'রাজনৈতিক হিন্দু' এই যুগপুরুষের জীবন, দর্শন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উজ্জ্বল ইতিহাস আজ অবহেলিত ও বিস্মৃত। ইতিহাস খোঁজ রাখেনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘ এবং পরবর্তীকালে জনতা দলের জয়যাত্রার অন্যতম ভিত্তিভূমি সেদিনের মেদিনীপুর জেলার ভূমিকাকে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারত তখনও তার সংবিধান কার্যকর করে উঠতে পারেনি। উচ্চ শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান, দেশহিতৈষী, নিঃস্বার্থ রাজনীতির অন্যতম মুখ প্রাজ্ঞ এই ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংবিধান খসড়া কমিটির অন্যতম সদস্য করা হলো। মূলত শিক্ষা জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত এবং শিক্ষা আবহে বেড়ে ওঠা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুধুমাত্র সময়ের আহ্বান নেহাত এক কাকতালীয় ঘটনা। অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ করে নিপীড়িত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বলি হওয়া হিন্দুদের পরিত্রাণের অভিপ্রায়ে তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণ। শিক্ষাজীবনে ১৯১৭ সালে বৃত্তি-সহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, ১৯১৯-এ আই এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার, ১৯২১-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম বিভাগে প্রথম এবং ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার পরও কেবল বাংলাভাষা প্রসারের লক্ষ্যে পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা বিষয় নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ-তে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

১৯২৯ সালে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন এবং ওই বছরই কংগ্রেসের

ফঃ ৫

সদস্য রূপে প্রাদেশিক কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। কিন্তু এক বছরের মাথায় ১৯৩০-এ কাউন্সিল বর্জন করেন এবং স্বতন্ত্র সদস্য রূপে নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার (১৯৩৪-১৯৩৮) গ্রহণ করে বাংলা বানান পদ্ধতি চালু, বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা নির্মাণ, সেকেন্ডারি থেকে এম.এ পর্যন্ত ভূগোল বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা, প্রাচীন সভ্যতা- সংস্কৃতি চর্চা ও মিউজিয়াম তৈরি, বাংলা ভাষায় পিএইচডি পত্র লেখার অনুমোদন, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় বক্তব্য প্রদান, 'শ্রী' ও 'পদ্ম'র ব্যবহার, ইসলামিক সাহিত্য বিভাগ চালু-সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে যুগান্ত সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর আগেই ১৯২৯-এ লাহোর অধিবেশনে 'মুসলিম লিগ' গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। সেই মুসিলিম লিগ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ তাদের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক ধর্ম ভিত্তিক 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে ১৯৩৭ সালে গঠিত কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ কোয়ালিশন সরকার, তা ১৯৪১ সালে ভেঙে যায়। দলীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ কৃষক প্রজা পার্টির নরম মুসলমান নেতা এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র হিসেবে কাজ করা বিশিষ্ট আইনজীবী এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা গঠনে অংশগ্রহণ করে বঙ্গে মুসলিম লিগের বিস্তার ঠেকানোর চেষ্টা করেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে দীর্ঘ ২৭ বছর জেল যন্ত্রণা ভোগের পর ১৯৩৭ সালে বীর সাভারকরের মুক্তি ঘটে এবং ১৯৪০ সালে কলকাতায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন করেন। হিন্দু মহাসভার সেই অধিবেশনে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন। কংগ্রেসের জাতীয়তা বিরোধী কার্যক্রমের বিরোধিতায় এবং ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি অধ্যাত্ম পরম্পরাকে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে হিন্দুদের সংগঠিত করার মহৎ কাজে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকর।

ভারতবর্ষ জুড়ে মুসলিম লিগের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের রুখে দাঁড়ানোর শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধ গান্ধীজী নস্যাৎ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেস প্রকারান্তরে ১৯৪৪ সালে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাবকে সমর্থন করে। সুরাবর্দির নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লিগ পশ্চিমবঙ্গ দখলের পর ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে পৈশাচিক 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং ওই বছরই নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন যজ্ঞের ভয়ংকর নারকীয়তার সময় পেরিয়ে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পেল। মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র এবং দিল্লি কংগ্রেসের পরোক্ষ মদতে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামি দেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার অভিসন্ধি নস্যাৎ করে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭-এর ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের আইন পাশ হলো। পূর্ববঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ। বাঙ্গালি হিন্দুরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হলো।

একদিকে দেশভাগের যন্ত্রণায় কাতর গোটা দেশ। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, উদ্বাস্তুদের হাহাকারে যন্ত্রণায় তখন কালো হয়ে আছে ভারতের আকাশ। হিন্দু শূন্য করার লক্ষ্যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের তাড়িয়ে দিতে তৈরি করা হলো সুপরিকল্পিত গুজব। লেলিহান শিকার মতো ছড়িয়ে পড়া সেই গুজব। দাঙ্গার আগুনে পুড়তে থাকল বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, খুলনা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকা। ১৯৫০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হলো ভয়ংকর দাঙ্গা। ৩৫ লক্ষেরও বেশি হিন্দু বাঙ্গালি সীমানা পেরিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন পশ্চিমবঙ্গে, এসব কিছুর একমাত্র কারণ ইসলামিক আগ্রাসন। প্রাণ হারালো ৫০ হাজার মানুষ, তাদের সকলের পরিচয় ধর্মে তারা হিন্দু। লুণ্ঠন করা হলো হিন্দুদের ঘরবাড়ি, হাজার হাজার হিন্দু নারীর ধর্ষণ-খুনের নারকীয়তার সাক্ষী থাকলো ইংরেজ শাসন থেকে সদ্য মুক্ত হওয়া স্বাধীন একটি দেশ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত হিন্দু নিপীড়ন ও উচ্ছেদের মাধ্যমে ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যা জিইয়ে রাখা এবং হিন্দুদের সুরক্ষা না দেওয়ার কারণে ১৯৫০-এর নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এবং নেহরুর মুসলমান তোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। আত্মনিয়োগ করলেন উদ্বাস্তুদের সেবায়, সাহায্যে ও পুনর্বাসনে।

রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার অভিযোগে ১৯৪৮ সালে হিন্দু মহাসভা ত্যাগ করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। দেশের প্রধান দল জাতীয় কংগ্রেসের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ এবং কমিউনিস্টদের নীতিহীন জাতীয়তা বিরোধী উদ্ভ্রান্ত রাজনৈতিক অন্ধকার আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভারত সংস্কৃতি, ভারত পরম্পরা এবং ভারত সত্তার ঘোর অনিশ্চয়তার সেই কালবেলায় দাঁড়িয়ে তৈরি করলেন একটি রাজনৈতিক দল, নাম দিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ। শুভ সেই দিনটি ছিল ২১ অক্টোবর, ১৯৫১। আদর্শ ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সেদিনের প্রধান সহযোগীরা হলেন বলরাজ মাধোক, দীনদয়াল উপাধ্যায়, লালা হংসরাজ গুপ্ত, লালা বলরাজ, ধরমবীর, পণ্ডিত মৌলিক চন্দ্র শর্মা, সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারী, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং চৌধুরী শ্রীচন্দ্র প্রমুখ। মূলনীতি ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং অনৈতিক পাকিস্তান তোষণের বিরোধিতা করা। লক্ষ্য হিন্দু জাতীয়তা, হিন্দুত্ব, অখণ্ড মানবতাবাদ এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল এক দেশ এক নিশান, এক সংবিধান, এক আইন এবং অবশ্যই ৩৭০ ধারার দ্রুত অবলুপ্তি। ওই বছর ১৯৫১-তে দিল্লিতে দলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাপতি হন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

১৯৫১ সালে তৈরি হওয়া সেই ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার পর একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে গঠন করলো জনতা পার্টি। সদ্য গঠিত সেই সংযুক্ত জনতা দল ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জাতীয় কংগ্রেসকে পরাজিত করে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলো। অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরোতে হয়েছে দলকে। দেশের প্রয়োজনে এবং ভারত মাতার দুঃখ মোচনকে সামনে রেখে নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থকে দূরে সরিয়ে অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮০ সালে জনতা পার্টির অবলুপ্তি ঘটিয়ে জনসঙ্ঘের প্রাক্তন সদস্যরা গঠন করেন ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। শ্যামাপ্রসাদের জনসঙ্ঘের নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত হওয়া বিজেপি দলটি ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দুটি আসনে জয়লাভ করেছিল। একটি অন্ধ্রপ্রদেশের হানামকোন্ডা থেকে সি জঙ্গারেড্ডি এবং অপরটি গুজরাটের মেহেসানা থেকে এ কে প্যাটেল। জাতীয়তা, হিন্দুত্ব, ভারতমাতার উজ্জীবন মন্ত্রকে বুকের গহীনে আঁকড়ে ধরে এবং রাম জন্মভূমি আন্দোলনের হাত ধরে আবার এই দলের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীতি ও আদর্শভিত্তিক জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি গঠিত হওয়ার মাত্র ষোলো বছরের মধ্যে, ১৯৯৬ সালে সংসদে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ণ মেয়াদের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। মাত্র ৪০ বছর আগে তৈরি হওয়া সেই দল আজ সারা পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন। নথিভুক্ত মোট সদস্য ১২ কোটি, দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি অব চীনের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৫১ সালে তৈরি হওয়া সেই অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৯৫১-৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শতাংশের বিচারে ৩ শতাংশ ভোট নিয়ে প্রথম থেকেই জাতীয় দলের মর্যাদা পাওয়া জনসঙ্ঘ তিনটি লোকসভা আসন জেতে। দক্ষিণ কলকাতা আসনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুর্গাচরণ ব্যানার্জি এবং রাজস্থান থেকে নির্বাচিত হন উমাশঙ্কর ত্রিবেদী। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

আজ ভারতবর্ষের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন অতিক্রান্ত। যে স্বপ্নকে সামনে রেখে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায়রা অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ তৈরি করেছিলেন, সেই দলের যোগ্য উত্তরসূরিরা ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি ঘটিয়ে কাশ্মীরকে ভারতে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি, ভারতীয় হিন্দু পরম্পরা ও ঐতিহ্য স্থাপন করে, অযোধ্যায় রাষ্ট্রমন্দির নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে। ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে জওহরলাল নেহরুর মতোই তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী তিনি। তবে পার্থক্য একটা আছে। জওহরলাল যতবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ততবার দেশে বিধানসভা ও লোকসভার ভোট একসঙ্গেই হয়েছে। আর নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে কেবল সেই নিয়ম পুনরায় কার্যকর করতে চলেছেন, সেই প্রতিশ্রুতির নাম— এক দেশ এক নির্বাচন। জওহরলাল প্রথম মন্ত্রীসভায় যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন দেশে যতটা সম্ভব দ্রুত কার্যকর হবে এনআরসি— নির্দিষ্ট হয়ে যাবে ভারতীয় আর অনুপ্রবেশকারীর সীমারেখা, আজ তা নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে এগিয়েছে অনেকটাই। এক দেশ এক নিশান (৩৭০ ধারা বিলুপ্তি) হয়েছে, এক দেশ এক নির্বাচন হবে এবং সিভিল ইউনিক কোডের মাধ্যমে এক দেশ এক আইনও চালু হবে নিশ্চিতভাবে। ভারতীয় সংবিধানের মূল ভাবনা কার্যকর হবে, সম্পূর্ণ হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, বল্লভভাই প্যাটেল ও দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখের স্বপ্ন।

সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর বিধানসভা নিরিখে ভারতীয় জনতা পার্টি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ইতিহাসের পাতা উলটালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘের প্রথম নির্বাচন, পরবর্তীকালে জনতা দল (১৯৭৭) এর প্রথম নির্বাচন এবং আজকের বিজেপির (২০২৪-এর লোকসভা) নির্বাচনী ফলাফলের পরম্পরা ও উত্তরাধিকার, এক সোনালি স্বাক্ষরের আলো হয়ে জেগে থাকে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট আসন ছিল ২৩২। স্বাধীন ভারতের প্রথমবার সেই নির্বাচনে অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জিতেছিল মোট ন'টি আসন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সারাদেশে রাজস্থান বিধানসভা থেকে আটটি আসন ছিল জনসঙ্ঘের। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫২-র সেই নির্বাচনে কিষান মজদুর প্রজাপার্টি ১৫টি, হিন্দু মহাসভা মহাসভা ৪টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ১৩টি, কমিউনিস্ট পার্টি ২৮টি এবং কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পেয়েছিল ১৫০টি আসন। স্বাধীন দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নবগঠিত অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ন'টি আসনের মধ্যে আটটি আসনই ছিল অখণ্ড মেদিনীপুরের।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের সেদিনের যুদ্ধ জয়ের সৈনিকরা ছিলেন ১. বিনপুর থেকে নৃপেন্দ্র গোপাল মিত্র, ২. ঝাড়গ্রাম থেকে মদনমোহন খান, ৩. নারায়ণগড় থেকে কৃষ্ণচন্দ্র শতপতি, ৪. পিংলা থেকে পুলিনবিহারী মাইতি, ৫. দাঁতন থেকে যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী, ৬. পটাশপুর থেকে জনার্দন সাউ, ৭. মোহনপুর থেকে বসন্তকুমার পাণিগ্রাহী এবং ৮. ভগবানপুর থেকে রামেশ্বর পণ্ডা। অখণ্ড মেদিনীপুরের বাইরে কেবল কুলপি থেকে, ৯. রামকৃষ্ণ কুমার জয়যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুর পরের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনগুলোতে জনসঙ্ঘ সেইভাবে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। কেবল ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে গোসাবা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রার্থী হিসেবে জিএন মণ্ডল জয়যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭২-এর সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘের কোনো প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ছিল না। এরপর এল সেই ১৯৭৭-এর নির্বাচন। জনসঙ্ঘ ভেঙে তৈরি হলো জনতা দল। লড়াইয়ের মাঠে নামলেন মেদিনীপুরের জাতীয়তাবাদী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উত্তরসূরি নেতৃত্ব। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সেবার জনতা দলের

আসন সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯। মোট ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিপিআই ছাড়া বামফ্রন্ট পেল ২৩১টি আসন। জাতীয় কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেই প্রথম, দ্বিতীয় বৃহৎ দলের মর্যাদা অর্জন করল জনতা দল। বিরোধী দলনেতা হলেন প্রফুল্ল সেন।

১৯৭৭-এর সেই নির্বাচনে গোটা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে অভূতপূর্ব ফলাফল করলো শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে ও আবেগে তৈরি জনতা দল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মোট ১৬টি বিধানসভা আসনের তমলুক (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) ও ময়না (পুলক বেরা) বামফ্রন্ট জিতলেও ১৪টি আসনেই জয়যুক্ত হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিষ্ঠাতা জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি জনতা দল। বর্তমান ভৌগোলিক মানচিত্রে পূর্ব মেদিনীপুরে জনতা দলের দখলে যাওয়া ১৪টি আসন হলো— পাঁশকুড়া পূর্ব (স্বদেশ মাঝি), মহিষাদল (শাশ্বতী বাগ), সুতাহাটা (শিবনাথ দাস), নন্দীগ্রাম (প্রবীর জানা), নরঘাট (বঙ্কিম বিহারী মাঝি), ভগবানপুর (হরিপদ জানা), খেজুরি (সুনির্মল পাইক), কাঁথি উত্তর (রাসবিহারী পাল), কাঁথি দক্ষিণ (সত্যব্রত মাইতি), রামনগর (বলাইলাল দাস মহাপাত্র), এগরা (প্রবোধ চন্দ্র সিনহা), মুগবেড়িয়া (কিরণময় নন্দ) এবং পটাশপুর (জন্মেজয় ওঝা)। সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে পূর্ব মেদিনীপুরের জনগণ ১৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসনই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে উপহার দিয়েছে। ১৯৭৭ থেকে ২০২৪, 'ফিরে ফিরে আসা ইতিহাস' আবারও বীরদর্প প্রত্যার্পণের নজির সৃষ্টি করলো। জয় হলো রাষ্ট্রবাদের, পূর্ব মেদিনীপুরের মাটিতে তোষণহীন রাজনীতির ধ্বজা উত্তোলিত হলো সগর্বে।

সব প্রদীপ প্রজ্বলনের পেছনেই লুকিয়ে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। প্রথম নির্বাচনে এই বিপুল জয়ের পেছনে ১৯৪২ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মেদিনীপুরের জন্য আত্মত্যাগই আজকের এই সোনালি সকালের মহামূল্য রসদ। ১৯৪২ সাল। মেদিনীপুরে তখন এক উত্তাল সময়। ভারতছাড়ো'র উন্মত্ততায় গোটা মেদিনীপুর জেলা তখন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, পিকেটিং, অবরোধ, হরতাল, পুলিশের নির্যাতন, ধড়পাকড়, জেলবন্দি প্রভৃতিতে উত্তপ্ত। পরপর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করে ইংরেজের হাঁটুতে কম্পন ধরিয়ে দেওয়া মেদিনীপুরে, আসার সাহস দেখাচ্ছেন না কেউ। অন্যদিকে সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়া, অজয় মুখার্জিদের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে 'স্বাধীন তাম্রলিপ্ত' সরকার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মেদিনীপুরে, বিশেষ করে কাঁথির সেই ভয়াবহ বন্যা ও সাইক্লোন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার এবং সংগ্রামী-দেশপ্রেমী মেদিনীপুরবাসীর উপর চূড়ান্ত দমনপীড়নের প্রতিবাদে এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। প্রত্যন্ত সব এলাকার বন্যা কবলিতদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করলেন 'বন্যা মোকাবিলা কমিটি'। সভাপতি হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং কোষাধক্ষ হয়েছিলেন পরবর্তীকালে 'পশ্চিমবঙ্গের রূপকার' খ্যাত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। মেদিনীপুরের মাঠে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সংগঠন করা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সেই পদচিহ্ন ধরেই আজকের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির এই জয়যাত্রা--- ১৯৫২-র জনসঙ্ঘ এবং ১৯৭৭-এর জনতা দলের সাফল্যের এক ঐতিহাসিক পরম্পরা।

মেদিনীপুরের মাটি সংগ্রামের মাটি, বিপ্লবের মাটি, নতুন ইতিহাস লিখে যাওয়ার মাটি। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বৌদ্ধ ধর্মের অগ্রগণ্য প্রধান পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত শহর (রেফারেন্স— ক্লডিয়াস টলেমি'র 'পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সি' গ্রন্থ)। মেদিনীপুরের মাটিতে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন শুধু সারা দেশের প্রথম সফল কৃষক আন্দোলনই নয়; বরং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে মেদিনীপুর ভূখণ্ডের নাম লেখা থাকবে, কখনোই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হওয়ার কারণে। অবশিষ্ট ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পতাকা উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। আর মেদিনীপুরের মাটিতে সুশীল ধাড়া-সতীশ সামন্ত-অজয় মুখার্জিদের হাত ধরে 'তাম্রলিপ্ত স্বাধীন সরকার' গঠিত হয়েছিল ১৯৪২-এ। এই বঙ্গপ্রদেশে প্রায় সব সূচনার উজ্জ্বল পথ বারবার মেদিনীপুরই তৈরি করেছে। মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের হাত ধরে বামফ্রন্ট শাসনের একটা যুগের অবসানের সাক্ষী থেকেছে গোটা দেশ। আর এবারের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল শুভ সূচনার এক ভিত্তি স্থাপন করলো মেদিনীপুর, নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে প্রায় সবগুলো বিধানসভা জয়লাভের মাধ্যমে। লোকসভা নির্বাচনের বিধানসভার ফলাফলের নিরিখে পূর্ব মেদিনীপুরের এই জয়যাত্রা ইতিহাসের কোনো মাইলস্টোন কিনা অপেক্ষা করবে গোটা দেশ।

তথ্যসূত্র :

১. ভারত কেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ— তথাগত রায়।

২. অবহেলিত ও বিস্মৃত নায়ক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— কমল মুখার্জি।

৩. কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ— রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়।

৪. শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি মৃত্যু প্রসঙ্গ— উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৫. রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৬. বাঙ্গালি পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ— ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ।

৭. Election Commission of India. STATISTICAL REPORT ON GENERAL ELECTION, (1952, 1957, 1962, 1972 & 1977) TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF WEST BENGAL.

৮. বাংলাদেশের ইতিহাস— ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

৯. স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা; প্রয়াস ও পরিণতি— অমলেন্দু দে।

১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)— অমলেশ ত্রিপাঠি।

১১. ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ— প্রতাপ ব্যানার্জি।

১২. Bhartiya Janata Party the rise of Modi and Indian Foreign Policy—Raja Qaizer Ahmed.

গোলকিপার

নিলয় সামন্ত

জীবন খুব অদ্ভুত তাই না? কখন কীভাবে আপনাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে বলা মুশকিল। এমি মার্টিনেজের কথাই ধরুন। ৫ বছর আগেও ইংল্যান্ডের সেকেন্ড ডিভিশনের ক্লাব রিডিঙের কিপার ছিলেন। সেখান থেকে আজ বিশ্বের সেরা গোলকিপারের তকমা তার নামের পাশে। উত্থান পতনের এই খেলায় মার্টিনেজ কোনোদিন ভেঙে পড়েননি। নিজের প্রতি আস্থা সবসময় রেখেছেন, যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন নিজের সেরাটা দিয়েছেন। আর্সেনালে লেনো যখন ইনজুরিতে পড়লো তারপর সেখানেও হলেন ফার্স্ট চয়েজ কিপার। দলকে জেতালেন এফএ কাপ। সেখান থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে এমি মার্টিনেজের আরেকটি অতি মানবীয় পারফরমেন্সের পর সকাল থেকেই নেট দুনিয়ায় একটা বিষয়ে তোলপাড় হতে দেখেছি যে সর্বকালের সেরা পেনাল্টি ও টাইব্রেকার স্পট কিক ঠেকানো গোলকিপারকে সে নিয়ে আলোচনায়। সেখানে অনেক নামই এসেছে। তারমধ্যে আর্জেন্টিনার ৯০ দশকের সাবেক গোলরক্ষক সার্জিও গয়কোচিয়ার নাম আলোচিত হলেও এই প্রজন্ম তার সম্পর্কে খুব কমই অবগত।

আমি ৮৬ সালে ম্যারাডোনার একক নৈপুণ্য নির্ভর ঐতিহাসিক ৮৬'র বিশ্বকাপের মাধ্যমে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্লাস সেভেনে পড়ুয়া কিশোরের

চোখে ম্যারাডোনা তখন মুগ্ধতা ছড়ানো এক নাম। বিটিভির কল্যাণে বিশ্বকাপ দেখে ম্যারাডোনা আবেশে তখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আর্জেন্টিনা জনপ্রিয় দলে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত গোটা বিশ্বেই আর্জেন্টিনার এত সমর্থন তৈরি করতে মেসির আগে ম্যারাডোনাই বড়ো অবদান রেখেছিলেন।

সদ্য কলেজের দোরগোড়ায় আসা যুবকের চোখে ৯০ বিশ্বকাপ আরও বেশি আর্জেন্টিনা নির্ভর। কিন্তু ঘটনাবহুল ওই বিশ্বকাপটা মানুষ মনে রেখেছিল কলম্বিয়ার পাগলাটে গোলকিপার হিগুইটা, ক্যামেরুনের বুড়ো রজার মিলা, স্বাগতিক ইটালির সেমিফাইনালে বিদায়, মেক্সিকান রেফারি কোডেসালের বিতর্কিত রেফারিং, ফাইনালে পেনাল্টি গোলে জার্মানির চ্যাম্পিয়ানশিপ এসবের কারণে। তবে এই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলটাও ছিল নানান আজব ঘটনার বাহক। সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ান হিসেবে গ্রুপ পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলতে নেমে তারা নবাগত আফ্রিকান অদম্য সিংহ হিসাবে পরিচিত ক্যামেরুনের কাছে হেরে যায়। পরে নানান নাটকীয়তার পর দলটি নক আউট পর্বে উঠতে সক্ষম হয়। ৯০'-র ম্যারাডোনা ৮৬'-র ম্যারাডোনার মতো কার্যকর ছিলেন না মোটেও। ধারে ভারে তিনি আগের বিশ্বকাপের ঝাঁঝ ধরে রাখতে পারেননি। আর্জেন্টিনার সেবারের কোচ তারপরেও এক অদ্ভুত ট্যাকটিসে দলটাকে খেলান। ম্যারাডোনাকে ঘিরে পুরো দলটাকে আবর্তন করেন। অনেকেই মজা করে বলতেন ১০-১ পদ্ধতি! দ্বিতীয় রাউন্ডে ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচে পুরো খেলার ৭০-৮০ ভাগ সেলেসাওদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, মুহুর্মুহু আক্রমণ করলেও ফিনিশারের অভাবে তারা ম্যাচটা হেরে যায়। ম্যারাডোনার একটা ম্যাজিক মোমেন্টে ম্যাচের রেজাল্ট ভিন্ন হয়। ম্যারাডোনা কয়েকজনকে কাটিয়ে এমন এক জায়গায় বলটা পাস দেন যেখান থেকে ক্যানিজিয়ার গোল করতে কোনই অসুবিধা হয়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আর্জেন্টিনা।

আর এখান থেকেই লাইম লাইটে চলে আসেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক সার্জিও গয়কোচিয়া। কোয়ার্টারে যুগোস্লাভিয়াকে টাইব্রেকারে একাই আটকে দেন গয়কোচিয়া। সেমিতে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হয় স্বাগতিক ইটালির। ম্যাচটি হয় ইটালির নেপোলিতে। সে সময় ম্যারাডোনা খেলতেন ইটালির সিরি-আ'র দল নেপোলিতে। নেপোলিকে তিনি ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন তা ফুটবলের খবর রাখা সবাই জানেন। তো এই ম্যাচের আগে ম্যারাডোনা এক সাক্ষাৎকারে 'নেপোলির দর্শকদের উচিত তার অবদানের কথা মনে রেখে স্বাগতিক ইটালিকে বাদ দিয়ে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করা— জাতীয় পাগলাটে মন্তব্য করেন। যেটি ঘৃতাহুতির কাজ করে। স্বাগতিক দর্শকদের চরম বৈরিতার সম্মুখীন হয় আর্জেন্টিনা। তবে সেই বৈরী সেমিফাইনালেও গয়কোচিয়ার একক নৈপুণ্যে ইতালির বিপক্ষে টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনা জয়ী হয়। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে মেক্সিকান রেফারি কোডেসালের দেওয়া বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্তে কপাল পোড়ে আলবিসেস্তেদের। পেনাল্টি গোলে চ্যাম্পিয়ান হয় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি। আর গয়কোচিয়ার বীরত্বগাঁথাও অনেকটা আড়াল হয়ে যায়। গয়কোচিয়া ক্ষিপ্রতায় ৯০ বিশ্বকাপ ছাড়াও ১৯৯৩ সালের কোপা আমেরিকায় কোয়ার্টার ও সেমিতে টাইব্রেকারে জয় পায় আর্জেন্টিনা। এই ভদ্রলোক এখন ফুটবল কমেন্টেটর ও প্রেজেন্টারের কাজ করেন।

এক ঝাড়ুদারের আবিষ্কার

সপ্তদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক। নেদারল্যান্ডের ডেলফট্ শহরের এক চশমার দোকানে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে এক কিশোর। দোকানের কর্মচারীরা কাচ ঘষে ঘষে চশমা তৈরি করে। সেটাই মন দিয়ে দেখে ছেলেটা। কী মজা পায় কে জানে!

ছেলেটার বাবা মারা গিয়েছে কয়েক বছর আগে। আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। তাই স্কুলের পাঠ শেষ না করেই চাকরি নেয় এক মুদির দোকানে। মাইনে সামান্যই। এর মধ্যেই পৌরসভার একটা চাকরি জুটে যায়। বড়ো চাকরি নয়, ঝাড়ুদারের চাকরি। পেট চালাতে হলে এছাড়া উপায়ই-বা কী?

ছেলেটা চশমার দোকানে কাচ ঘষা দেখে একটা ব্যাপার বুঝেছে। এক টুকরো কাচ ঘষে উঁচু করতে পারলে সেটা লেন্সে পরিণত হয়। তার ভেতর দিয়ে তাকালে ছোটো জিনিস বড়ো দেখায়। ছেলেটা নিজেই এই জিনিস তৈরি করার কথা ভাবে এক সময়। বোঝে, কাচ আরও সুন্দরভাবে ঘষে আরও নিখুঁত করে তুলতে পারলে সেটা আরও ভালো লেন্সে পরিণত হবে।

বাড়ি ফিরে সত্যি সত্যিই কাচ ঘষে লেন্স তৈরি করে ছেলেটা। চশমার দোকানের চেয়েও ভালো লেন্স। সেই লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালে যে কোনো জিনিস দু'তিনশো গুণ বড়ো দেখায়। ছেলেটার উৎসাহ বাড়ে। আরও ভালো লেন্স তৈরি করে সে। তামার পাত দিয়ে তৈরি একটা ফাঁপা নলের মাথায় লাগিয়ে দেয় সেই লেন্স। তৈরি হয় একটি যন্ত্র। আর ছেলেটার সামনে হাট করে খুলে যায় খুদে প্রাণীদের এক অবিশ্বাস্য জগৎ। প্রথম দিকে যা সামনে পেত তাই এই যন্ত্রের নীচে রেখে অবাক হয়ে দেখত।

ছেলেটার বয়স বাড়তে থাকে। কিন্তু সেই যন্ত্রের নেশা তাঁকে ছাড়ে না। তিনি কাচ ঘষে ঘষে লেন্স বানান। এভাবে তিনি চারশোর বেশি যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন। একদিন কী মনে করে সেই যন্ত্রের নীচে এক ফোঁটা জল ফেলে পরীক্ষা শুরু করলেন। আর ওমনি আর একটা আবিষ্কারের দুয়ার খুলে গেল। দেখলেন, ওই এক ফোঁটা জলের মধ্যে বিকট, ভয়ংকর সব প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর অজান্তেই ঘটে গেল চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক মহাবিপ্লব। পরে এডওয়ার্ড জেনার এবং লুই পাস্তুরের হাতে সেই জগৎ আরও বড়ো হতে থাকে।

লোকটি ক্ষুদ্র জিনিসপত্র পর্যবেক্ষণ করেন আর সেগুলো খাতায় টুকে রাখেন। ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগবে ভেবে তিনি তা করতেন না। তখনো তিনি ঝাড়ুদারের চাকরিই করেন। তবে এটা যে একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তা তিনি বুঝতে পারেননি।

এর মধ্যেই কেউ একজন তাঁকে জানায়, ব্যাপারটা যদি ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির লোকজনকে জানানো যায় তাহলে তাঁরা এর মর্ম বুঝবেন। কিন্তু তিনি তো একজন ঝাড়ুদার। এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়ার টাকাপয়সা তাঁর নেই। তাই রয়্যাল সোসাইটির ঠিকানা জোগাড় করে সেখানকার বিজ্ঞানীদের চিঠি লিখে ব্যাপারটা তিনি জানালেন। রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা প্রথমে এটাকে আমল দিত চাননি। কিন্তু সবাই তো একরকম নন। কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছাব্বিশটা যন্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীদের কাছে।

রয়্যাল সোসাইটি তখন বিজ্ঞান জগতের হর্তাকর্তা। তাদের থেকে কোনো আবিষ্কারের স্বীকৃতি না পেলে বিজ্ঞান জগতে সেটার টিকে থাকা মুশকিল। একটি যন্ত্র হাতে পেয়েছেন সেই বিজ্ঞানীরা। পরীক্ষা করে দেখতে তো দোষ নেই! তাঁরা সেই যন্ত্রের নলে চোখ লাগিয়ে দেখলেন, ঝাড়ুদার লোকটা চিঠিতে যা জানিয়েছেন তার সবটাই সত্যি।

সুতরাং তাঁকে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য করে নেওয়া হলো। বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরাই কেবল রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হতে পারেন। এতে ঝাড়ুদার লোকটির সম্মান অনেকখানি বাড়ল। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য স্বয়ং রাশিয়ার রাজা এবং ইংল্যান্ডের রানি পর্যন্ত ডেলফট্ নামের সেই ছোট্টো শহরে গিয়েছিলেন। পা দিয়েছিলেন তাঁর জীর্ণ কুটিরে। সেই ঝাড়ুদারের নাম হলো লিউয়েন হুক, যিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

সংগৃহীত

পাহাড়-পর্বত

শুশুনিয়া পাহাড়

বাঁকুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ছাতনা। ছাতনা থেকে আরও ১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে শুশুনিয়া পাহাড়। উচ্চতা ১২০০ ফুট। পুরাতত্ত্ব ও জীবাশ্মের ভাণ্ডার এই পাহাড়। সিংহ, জিরাফ, হায়না, এবং আরও নানা প্রাণীর জীবাশ্ম এখানে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে আদি সভ্যতা নানান সামগ্রী। রয়েছে পশ্চিমঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপি। গবেষকদের মতে, রাজা চন্দ্রবর্মনের দুর্গ ছিল এই পাহাড়ে। এই পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণ হলো তার জলধারা। পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে জল। এই জলে রয়েছে নানান ঔষধি গুণ। শুশুনিয়া পাহাড়ে রয়েছেন মহাদেব শিব। এখানকার পাথর খোদাই শিল্প খুবই বিখ্যাত।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩২

ক্লীবলিঙ্গ (পুংলিঙ্গের মতো হবে)

পুস্তকম্-পুস্তকস্য (বই-বইয়ের)

পুস্তকস্য লেখক: রবীন্দ্রনাথ:-বইয়ের লেখক রবীন্দ্রনাথ।

অভ্যাস করি -১

ফুলস্য-ফুলস্য,বাড়ির-গৃহস্য,ছবির-চিত্রস্য, কাপড়ের-বস্ত্রস্য,জলের-জলস্য, মন্দিরের-মন্দিরস্য।

অভ্যাস করি-২

রামায়ণস্য লেখক: ক:? রামায়ণস্য লেখক: বাল্মীকি:।

মহাভারতস্য লেখক: ক:? মহাভারতস্য লেখক: ব্যাসদেব:।

শ্রীকান্তস্য লেখক: ক:? শ্রীকান্তস্য লেখক: শরত্চন্দ্:।

প্রয়োগ করি–

পুংলিঙ্গের মতো নামের সঙ্গে স্য /স্য যুক্ত হবে। মিত্রম, যন্ত্রম, পুষ্পম, ভবনম,ফেনকম দ্বারা অনুরূপ বাক্য তৈরি করতে হবে।

ভালো কথা

চড়াইছানা

আমাদের ঘরের ঘুলঘুলিতে প্রতি বছরই দুটো চড়াই বাসা বাঁধে। ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে ছানা হয়। ছানা বড়ো হয়ে উড়ে চলে যায়। এবারও দুটো ছানা হয়েছে। সারাদিন চড়াই দুটো ঠোঁটে করে খাবার এনে ছানাদের খাওয়ায়। এখনো ভালো করে উড়তে শেখেনি, তারমধ্যেই দুটো ছানা একদিন ঘরের মেঝেতে পড়ে গেছে। আমি ছানা দুটোকে একটা ছোটো কাগজের বাক্সে রেখে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছি। চড়াই দুটো ওখানেই খাবার এনে ছানাদের খাওয়াচ্ছে। আমি ছানাদুটির মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। ওরা ভয় করে না।

সমীর কুমার মাহাত, নবম শ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) দি বি আ

(২) হা বি ক

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) তা ণ্য দে অ ব র

(২) ন প ৠ র অ ত

---

১৫ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) জগাখিচুড়ি (২) জঠরানল

১৫ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) জনসেবামূলক (২) ঠাকুরমহাশয়

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্যামলী রায়, জামালদহ, কোচবিহার। (২) পুলক দাস, ধূপগুড়ি, জলপাউগুড়ি।
(৩) শ্রেয়া চক্রবর্তী, ইটাহার, উঃ দিনাজপুর। (৪) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ডহারবার।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

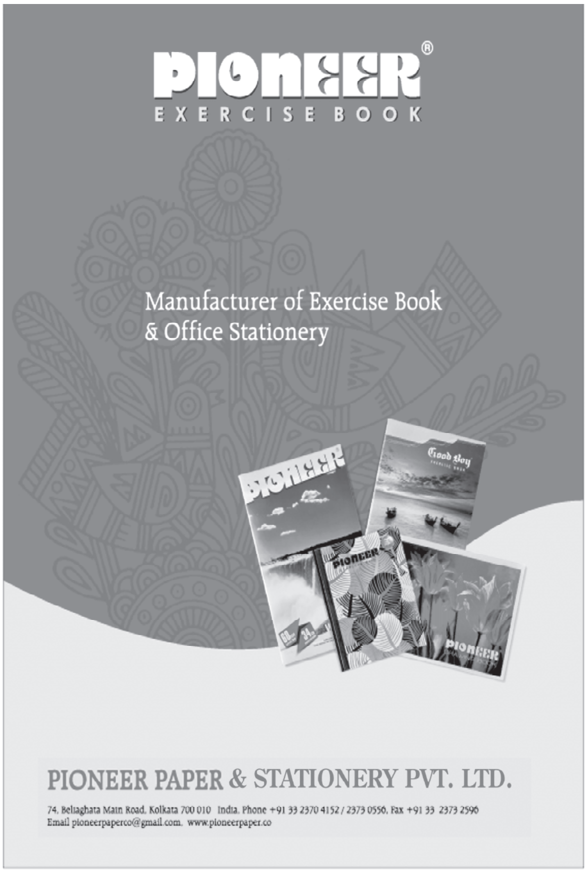

With Best Compliments from -

A

Well wisher

বাঙ্গলার বনবাসী ও গিরিবাসী গল্পকথায় সবুজের ছোঁওয়া

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে প্রাণের জন্মের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে এই গ্রহে কত জীবের আবির্ভাব ঘটেছে, কত জীবের রূপান্তর ঘটেছে, কত জীব চিরতরে হারিয়ে গেছে। অতীতের কথা বাদ দিলেও আজকের পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। সেই অপরিমেয় সৃষ্টির জৈবমূল্য নির্ধারণ আরও কঠিন। সৃষ্টির এই সীমাহীন বৈভব অবলোকন করেই আদি মানব এক 'বিরাট' ব্যক্তিত্বের কল্পনা করেছে, ভয়-ভক্তি শ্রদ্ধায় তার কাছে নত হয়েছে। লেপচা পুরাণ কথার 'আমাদের আদি মাতা' গল্পে দেখানো হয়েছে আদি দেবতা অনেক জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। শেষকালে তিনি সৃষ্টি করলেন মানুষ। পৃথিবীর সব চাইতে ছোটোভাই 'মানুষ'— আর অন্য ভাইয়েরা হলো ঘাস-গুল্ম-পাহাড়-ঝরনা-নদী-জীবজন্তু— সবাই মানুষের আগে জন্মেছে। ওই গল্পে আরও বলা হয়েছে আদি দেবতা কচ্ছপ সৃষ্টি করে জলমগ্ন পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন, তার পিঠে বসালেন মাটির পাত্র। যুগ যুগান্তর ধরে মাটির পাত্রের ওপর সবুজের আস্তরণ পড়ল। সবুজের আভা থেকে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠল কচি কচি সবুজ ঘাস— তারপর ছোটো ছোটো লতা, তারপরে গুল্ম, তারপরে ছোটো গাছ, তারপরে অন্য বড়ো বড়ো গাছ। মাটির পাত্র বড়ো হলো, তার উপর ছড়িয়ে পড়ল ঘাস, লতা, গুল্ম, গাছ।

খেড়িয়া পুরাকাহিনি 'আমাদের আদি সৃষ্টিকর্তা' গল্পে দেখানো হয়েছে পৃথিবীতে প্রথম মানব-মানবীর আগমন কথা। পৃথিবী যখন প্রথম সৃষ্টি হলো, তখন সবদিকে ছিল ঘন বন। কেননা আদিতে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল বনজঙ্গল, গাছ, ঝোপ, লতা, গুল্ম। ভগবান অনেক ভেবে মাটির তাল থেকে দুটি মূর্তি তৈরি করলেন— একটি পুরুষের, অন্যটা নারীর। মূর্তি তৈরির পর একটা পুরনো বট গাছের কোটরে রেখে দিলেন। বটগাছের ডাল-পাতা থেকে সাদা কষা-দুধ মূর্তিতে পড়ে তাতে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল।

বিরহড় লোককথা (পুরাণকথা) 'রাম-সীতা-হনুমান' গল্পে তেঁতুল *(Tamarindus indica)* আর খেজুর *(phoenix dactylifera)* পাতার অভিযোজনের গল্প শোনানো হয়েছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলে গেল। সেখানে তারা 'উথ্‌লু' বিরহড়দের মতো যাযাবরের জীবন কাটাতে লাগল। তারা থাকত পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে। একবার তারা একটা মস্ত বড়ো তেঁতুল গাছের তলায় ঘর তৈরি করল। সেই সময় তেঁতুল গাছের পাতা ছিল মস্ত বড়ো। তার ভেতর দিয়ে রোদ ঢুকতে পারত না। রাম ভাইকে বলল, আমরা বনবাসে এসেছি, এখানে কষ্টে থাকতে হবে, আরাম করা চলবে না। কিন্তু এই গাছের ছায়ায় আমরা সুখে আছি, আমাদের গায়ে রোদ বৃষ্টি লাগছে না। এটা তো ঠিক নয়।

ফ ঃ ৬

তুমি তির মেরে পাতাগুলোকে চিরে দাও। লক্ষ্মণ তির মেরে তেঁতুল পাতাগুলোকে চিরে ফালাফালা করে দিল। একটা পাতা চিরে অনেক ছোটো ছোটো পাতা হয়ে গেল। সেই পাতার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল আর রোদের তাপ তাদের দেহে লাগল। সেইদিন থেকেই তেঁতুল পাতা এত ছোটো ছোটো হয়ে গেল। আবার চলেছে তিনজন বনপথ দিয়ে। এবার তারা ঘর তৈরি করল খেজুর গাছের নীচে। সেকালে খেজুর পাতা ছিল খুব লম্বা আর চওড়া। বৃষ্টির জল আটকে দিত সেই পাতা। রাম আবার ভাইকে তির ছুঁড়তে বলল। লক্ষ্মণ তির মেরে খেজুর পাতাকে সরু সরু করে দিল। সেইদিন থেকে খেজুর পাতা সরু সরু হয়ে গেল।

সাঁওতাল লোককথা 'সাবাই ঘাসের জন্ম কথা'য় দেখানো হয়েছে মানুষের চুল থেকে জন্ম নিয়েছে সাবাই বা বাবুই ঘাস *(Eulaliopsis binata)*। যেহেতু সাবাই-এর পাতা সরু, লম্বা এবং বেশ শক্ত, সেই জন্যই লোকমানস বিশ্বাস করেছে চুল থেকে তার উদ্ভব সম্ভব। সাবাই ঘাস জনজাতি গোষ্ঠী বিশেষত শবর উপজাতিদের একটি অর্থকরী ফসল। রাঢ় বাঙ্গলার শুষ্ক টাঁড় জমিতে এই ঘাস হয়, আবার অর্থকরী চাষও শুরু হয়েছে। পাতা দিয়ে দড়ি, খাটিয়া, কাগজ ছাড়াও বসার মোড়া, লক্ষ্মীঝাঁপি-সহ অপরাপর গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত হয়।

বিরহড়লোক কথা 'ভগবান সিংবোঙা মানুষ সৃষ্টি করলেন' গল্পে আদিকালের উদ্ভিদরূপে পদ্ম *(Nelumbo nucifera)* উপস্থাপিত : ''সেই আদিকালে গোটা পৃথিবী জলে থই থই করত। কোথাও ডাঙা নেই। জলেও কিছু ছিল না, ছিল শুধু একটা পদ্মফুল। একটাই পদ্ম গাছ। আমাদের সবচেয়ে প্রধান দেবতা ভগবান সিংবোঙা তখন পাতালে থাকতেন। জলের উপরে জেগে ওঠা পদ্ম ফুলের ডাঁটা জলের ভেতর দিয়ে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে, পাতালে নেমে গিয়েছে। সিংবোঙা পদ্মডাঁটার মধ্য দিয়ে উপরে উঠে এলেন। ভেসে উঠলেন জলের ওপরে।'' এই গল্পেই দেখতে পাই ভগবান সিংবোঙা পৃথিবীতে উদ্ভিদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, ''...সমতল হলো বেশিরভাগ জায়গা।—ফসলের ক্ষেত, বসতবাড়ির জায়গা, বনভূমি, পশুচারণ ভূমি, ঘাস জন্মাবার জায়গা। ভগবান সিংবোঙার কাছে ছিল কতরকমের বীজ। তিনি সেগুলো ছড়িয়ে দিলেন পৃথিবীতে। জন্মনিল গাছপালা, ঘাস, লতা, ঝোপঝাড় গুল্ম। জলেও ছড়িয়ে দিলেন বীজ, সেখানে নানা ধরনের ফুল, সবজি, শ্যাওলা আরও কত কী।'' দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতীকে পদ্ম উপস্থাপিত, ''দুজনে স্নান সেরে দুঘাটের দুই পদ্ম ফুল ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলেন। ঢেউয়ে দুই পদ্ম এক হলো। দু'জনে উলু দিলেন।'' ('পুষ্পমালা' কাহিনি)

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫'', সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।
যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

রাভা লোককাহিনি 'আমরা বাঁশি পেলাম কেমন করে' গল্পে শরকাঠির মাচায় শুয়ে আশ্রয় নেওয়া রাভা পূর্বপুরুষ মানুষ খেকো ভূত তাড়াতে একটা শর টেনে তার খানিক ভেঙে ঠোঁটের কাছে ধরে শব্দ করল 'পু-উ-উ, পু-উ-উ'। ভূতেদের নাচ থেমে গেল। তারা গাছের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের বুঝি প্রাণ যায়। 'হু-উকা, হু-উকা' করে সব ভূত নিমেষে উড়ে গেল। পরে সেই শরকাঠির আদলে তৈরি হলো নানান রকমের বাঁশি বা 'কাল'। এই উদ্ভিদটি আসলে নল/গাবনল/বড়ো নল/বংশী নল। বিজ্ঞানসম্মত নাম *Arundo donax*। এই ঘাসের কাণ্ড ফাঁপা এবং প্রায় ৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। আশ্বিন সংক্রান্তিতে (নল সংক্রান্তিতে) নল গাছের পুজো হয়।

টোটো লোককথা 'মিষ্টি কুমড়ো ও রাজকন্যা' গল্পে মিষ্টি কুমড়ো *(Cucurbita maxima)* চাষের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বনের ভিতরে খানিকটা জায়গা আগাছা পরিষ্কার করে যে চাষের জমি তৈরি হয়েছে তার ঝুরঝুরে মাটিতে বোনা হয়েছে মিষ্টি কুমড়োর বীজ। চারা বড়ো হয়ে লক্‌লকে সবুজ পাতার লতা ছড়াল। অনেক ফুল এলেও ঝরে পড়ল সব। মাত্র একটি কুমড়ো ফলল বিরাট লতানো গাছে। যারা চাষ করেছিল এই কুমড়ো, সেই ঠাকুরদা আর ঠাকুমা গাছ থেকে একমাত্র কুমড়োটি কেটে এনে রাখল। একদিন ঠাকুমা সে কুমড়ো রাঁধতে যাবে, তখন কুমড়ো বলে উঠল, আমায় কেটো না, আমি তোমাদের দেখাশোনা করব। দুজনে সায় দিল কুমড়োর কথায়। সেই থেকে কুমড়ো রোজ জমিতে চাষ করে। বন পরিষ্কার করে কুমড়ো চাষ হতে লাগল। কিছুদিন বাদে সমগ্র জমি কুমড়োয় ভরে গেল। বুড়ো-বুড়ির জীবনধারণের চিন্তা রইল না।

বাবুইঘাসের ঝাড়ু

মিষ্টি কুমড়ো ভারতীয় ফসল নয়। এর আদি-নিবাস হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা। এমন একটি ফসল ভারতবর্ষে এসেছে ঔপনিবেশিকদের দ্বারা। অরণ্য প্রান্তে বসবাসকারী টোটো উপজাতি এমন একটি চমৎকার ফসল পেয়ে নিজেরা চাষ করতে শুরু করেছে— তারই বার্তা নিয়ে হাজির এই গল্পটি। সেদিক থেকে বলতে গেলে গল্পটি অর্বাচীন কালের।

মুণ্ডা ও হো লোককথা 'এক পাল বুনো মোষ' গল্পে লোয়া ফলের প্রসঙ্গ রয়েছে, 'লোকটি স্নান সেরে নদীর ধারে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। ...আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা চুল গোড়া থেকে উপড়ে এল। পাশে

পড়েছিল একটা লোয়া ফল। সে ফলটাকে দু'ভাগ করে তার মধ্যে চুলটাকে জড়িয়ে ঢুকিয়ে দিল। আবার লোয়া ফলটিকে আপন খেয়ালে ফেলে দিল নদীর জলে। লোয়া ফল ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গেল। সে তাকিয়ে রইল। আরও দূরে। আর ফলটিকে দেখা যাচ্ছে না। সে ফিরে এল মোষেদের আস্তানায়।...ফল ভাসছে, ভাসছে।...নদীর এক জায়গায় স্নান করছিল সেই গাঁয়ের সর্দারের মেয়ে। লোয়াফল মেয়ের পাশ দিয়ে যেতেই সে সেটাকে ধরে ফেলল। ফাঁক করল। ভেতরে দেখতে পেল লম্বা চুল। তাড়াতাড়ি চলে এলো বাবার কাছে। মেয়ে বলল, এই লম্বা চুল যে মানুষটির, আমি তাকেই বিয়ে করবো। আর কাউকে নয়।''

খেড়িয়া লোককথা 'ভালুক ও বর-বউ' গল্পে 'ওলাই' ফলের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে : ''ভালুক মহুয়া ফুল খেতে খুব ভালোবাসে। আর ভালোবাসে ওলাই ফল। কিন্তু এ বনে ওলাই গাছ খুব কম। তাই অনেক

করমপূজা

খুঁজে পেতে ভালুক একটা ওলাই বিচি জোগাড় করে গুহার পাশের মাটিতে পুঁতে দিল খুব যত্ন করে। একদিন ছোটো গাছ মাথা তুলল। নিত্য দিন গাছে জল দেয়। গাছ বড়ো হয়, আরও বড়ো, ভালুকের আনন্দও বেড়ে চলে। অনেক দিন হয়ে গেল। গাছে ফল হলো। সেই ফল খায় ভালুক। ...যেদিন এক শিকারি শিকার খুঁজতে খুঁজতে এই বনে চলে এল। ...তির-ধনুক নামিয়ে সে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল...

হঠাৎ নজরে পড়ল ওলাই গাছের ফলের দিকে। ...ফলগুলো ঝুলছিল। নীচু ডালেও অনেক ফল। সে লাফ দিয়ে একটা ফল পেড়ে মুখে দিল। আঃ কী সুস্বাদু! মন ভরে গেল। আরও দু-একটা খেল। বউয়ের জন্য একটা ফল সঙ্গে নিল।...বউ তো ফল পেয়ে বেজায় খুশি। কী মিষ্টি খেতে। আগে কোনোদিন তো খায়নি। এক কাজ করো, চল এক্ষুনি গিয়ে আরও কয়েকটা ফল নিয়ে আসি। রেখে রেখে খাব।...অনেকক্ষণ পরে তারা পৌঁছল বনের সেই ওলাই গাছের তলায়। এখন হয়েছে কী, সেই মেয়ে ভালুকও গুটিগুটি ওলাই গাছের দিকে যেতে লাগল। ...গাছের নীচে এসে ভালুক পেছনের দু' পায়ের উপরে বসে মাথা নুইয়ে তার ওলাই গাছকে পূজা করতে শুরু করল। প্রতিদিন সে পূজা করে। তার হাতে বোনা গাছ, ছোটো বীজ থেকে বেরনো গাছ, এমন ফলন্ত গাছ— তার নিজের গাছকে সে তো পূজা করবেই। এই গাছ ছাড়া তার নিজের বলতে আর তো কিছু নেই।'' এই গল্পে বৃক্ষ পূজা (Tree worship)-র কথা এসেছে।

চাকমা কাহিনি 'দুই বোন' গল্পে ''একটা মস্ত বড়ো ঘন বটগাছের ছায়ায় দুই বোন বসে রয়েছে। বটগাছের পাতায়-ছাওয়া ডাল নদীর ওপরে ঝুলে রয়েছে। বড়ো বোন হঠাৎ বলল, দেখ বোন, এই বট গাছের ডাল কী সুন্দর, নদীর জলের ওপরে দোল খাচ্ছে। হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। কেমন ঝুরি নেমেছে দেখ। আয়, আমরা ঝুরি ধরে দোল খাই।' 'করম ঠাকুর' কাহিনিতে দেখা যায় : যাইতে যাইতে বহুদূর এক গভীর বনের ধারে তারা উপস্থিত হইল। সেখানে এক বট গাছের নীচে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুদূর হাঁটিয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় জয়া-বিজয়া ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, সেই অবসরে ব্রাহ্মণ বৃক্ষ-নিবাসী দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গভীর রাতে জয়া-বিজয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইলে পিতাকে না দেখিয়া তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তাহাদের কান্না দেখে কে— চারিদিকে শুধু হিংস্র জন্তুর শব্দ, আর নানা দৃশ্য। ভয়ে তাহাদের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জয়া-বিজয়া বলিল, সত্য যুগের বটগাছ যদি হও, তবে আমাদের মাথায় তুলিয়া লও। বটগাছ অমনি মাথা নোয়াইয়া তাহাদের উঠাইয়া লইল। খেড়িয়া পশু কথা 'ভালুক ও বর-বৌ' গল্পের পরিবেশ তৈরি হয়েছে গাছগাছালির অনুষঙ্গে, ''শাল মহুয়া কেঁদ করম গাছের ঘন বন। আরও কত কী ঝোপঝাড়। অল্প উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড়ের গুহায় থাকে এক মেয়ে ভালুক।'' এ হলো লাল কাঁকুড়ে মাটির জৈব বৈচিত্র্য শাল *(Shirea robusta)*, মহুয়া *(Madhuca latifolia)*, কেঁদ *(Diospyros tomentosa)* ও করম *(Adina)*। মুণ্ডা ও হো পশু কথা 'এক পাল বুনো মোষ' গল্পেও পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের উদ্ভিদ পরিচিতি; ''মাঠ ছাড়িয়ে বনে ঢুকল। আরও গভীর বনে। শেষকালে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। চারিদিকে শাল মহুয়ার গাছ, মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে বুনো মোষের পাল রাতে ঘুমোয়।'' মুণ্ডা কাহিনি 'সাত ভাই এক বোন' গল্পে বোন কেঁদ গাছে উঠে পড়ে আর তার বিশাল গাছের গোড়ায় মানুষ থেকে সাপে রূপান্তরিত হওয়া তার ভাই গান গায় : ''বনের মধ্যে অনেক উঁচু এই কেঁদ গাছ, এই গাছে কী মদ্দা সাপ থাকে, এই গাছে কী মাদী সাপ থাকে।''

অর্থাৎ মুণ্ডাদের আদি বাসভূমি পার্বত্য ছোটোনাগপুর মালভূমি অধ্যুষিত জঙ্গল অঞ্চলের পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। সাঁওতাল কাহিনি 'আমরা এলাম কোথা থেকে' গল্পে পিলচু বুড়ির মেয়েরা বনের চাঁপাকিয়া গাছের ঝুরিতে ঝুলছিল। পিলচু বুড়ি মেয়েদের সাবধান করে— খাদ আছে, বনের শাকপাতা আর ছাতু কুড়তে তারা যেন না যায়। উষ্ণক্রান্তীয় অরণ্যের পাশাপাশি ভুটিয়া পশুকথা 'ভালুক ও কাঠবেড়াল' গল্পে শীতপ্রধান গাছপালা, ঘাস, বাদাম ও কন্দ ফসলের প্রসঙ্গ রয়েছে : ''আসছে, আসছে, দূরে পাহাড়ে উত্তুরে হাওয়া বইছে। পাহাড়ি নদীর জল কমে আসছে, গাছগাছালির পাতার রং বদলে যাচ্ছে। ...তখনও শীতের রেশ এখনো একেবারে কাটেনি। বনের আনাচে কানাচে বরফ জমে আছে। মাটির ওপরে কোনো সবুজ ঘাস নেই, গাছের নীচে কোনো

ফল পড়ে নেই। কোনো গাছের নীচেই বাদাম পড়ে নেই।"

গারো কাহিনি 'কীসের থেকে কী যে হয়' এবং মুণ্ডা-হো লোককথা 'এক পাল বুনো মোষ' গল্পে দেখা যাচ্ছে অরণ্য-সন্নিহিত ধানের ক্ষেত বন্য হাতি ও মহিষের দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে। প্রথম গল্পে হাতির কানে ছোটো পাখি ঢুকে ফর্‌ফর্‌ করে। ছুটতে ছুটতে সে এসে থামে চাষির খেতে। খেত ভরা সুন্দর ধান, তাতে সোনার রং। কানের ফর্‌ফরানির চোটে হাতি ফসলের খেতে ঘুরপাক খেতে থাকে। বিশাল দেহ আর গোদা পায়ের চাপে নষ্ট হয় চাষির সোনার ফসল। দ্বিতীয় গল্পে ধানের জমি নষ্ট করেছে বুনো মোষ। দুঃখে চাষির মাথায় হাত। ধান দলে-পিষে নষ্ট করেছে বুনো মোষের দল। যতটা পেরেছে খেয়েছে, বাকি ধান তাদের পায়ের চাপে, দেহের চাপে বিনষ্ট হয়েছে। এই গল্পেই প্রথমে দেখানো হয়েছিল এক সফল ধান চাষির কথা। "সবুজ লক্‌লকে চারা বেরুল...। কচি কচি চারা হাওয়ায় দুলছে। লোকটির চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ। চারা বড়ো হচ্ছে আরও বড়ো লক্‌লকে। একদিন তাতে ধান হলো। গাছ ভর্তি ধান। এত ধান আর কারও জমিতে কোনোদিন ফলেনি। ধানের ভারে গাছ নুয়ে পড়ছে।"

লোককথার অন্তর্লোকে একটি বিশ্বব্যাপী যোগসূত্র থাকলেও তাতে উপস্থাপিত উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য একেবারেই স্থানীয় পরিবেশ থেকে উৎসারিত। লোকগোষ্ঠী তার ঘরের কাছে যে জৈববৈচিত্র্য অবলোকন করেছে তাকেই ঠাঁই দিয়েছে কথার জাদুতে। সেই জন্য এই বনবাসী ও গিরিবাসীর লোককথা হয়ে ওঠে স্থানীয় কৃষি-জলবায়ুর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কয়েকটিমাত্র উদাহরণ নিয়ে দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে বঙ্গের উদ্ভিদকে অতি মনোরম দেখায়। লোককথা সেই লোকগোষ্ঠীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের এবং জৈববৈচিত্র্যের নির্ভরযোগ্য দলিল। গল্প বলা এবং গল্প শোনা মানুষের আদিমতম নেশা। সেই নেশার সূত্র ধরেই পরবর্তী প্রজন্মে রেখে যায় এক অনুপম উত্তরাধিকার।

তথ্যসূত্র :

বাংলার জৈববৈচিত্র্য ও লোকসংস্কৃতি, মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২৪, কবিতিকা, মেদিনীপুর।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোককথা, দিব্যজোতি মজুমদার, ২০০৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

জনজাতি সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, দক্ষিণবঙ্গ

অখিল ভারতীয় কল্যাণ আশ্রম ১৯৫২ সালে তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশের যশপুরে শুরু হয়। জরুরি অবস্থার পর পশ্চিমবঙ্গে কাজ শুরু হয়, সঙ্ঘ প্রচারক বসন্ত রাও ভট্টের হাত ধরে। ১৯৭৮ সালে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বাগমুণ্ডি ব্লকে পূর্ব ভারতের ১ম প্রকল্প— ছাত্রাবাস। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম নাম নিয়ে তৈরি হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য জনজাতি সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাবলম্বন, অধিকার ও ধর্মসংস্কৃতি রক্ষা করা। বর্তমান এই সংগঠন ১৪টি আয়ামে কাজ চলছে— ৮টি ছাত্রাবাস এবং ২টি ছাত্রীনিবাসে যথাক্রমে ২৮৬ ও ১১৪ বালক-বালিকা পাঠরত। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ছোটো বালক-বালিকাদের মধ্যে সংস্কার এবং সামাজিক সচেতনতার প্রকল্প ৫১৩টি চলছে। পর্যাবরণ কথা ভেবে জনজাতি কৃষকদের মধ্যে জল সংরক্ষণের কাজ ৬৫২টি ছোটো পুকুরের দ্বারা শুরু হয়েছে। জনজাতি মা-বোনেদের স্বাবলম্বন কাজ সেলাই প্রশিক্ষণের দ্বারা হচ্ছে ১০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে। গত ৫ বছরে ২৫০০ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছে। খেলোয়াড় অন্বেষণের কাজে, গ্রাম থেকে অখিল ভারতীয়স্তর পর্যন্ত জনজাতি অলিম্পিকের মাধ্যমে তিরন্দাজি, কাবাডি, খো-খো খেলার মাধ্যমে এসএআই-এর হাত ধরে সর্বভারতীয় খেলাতেও অংশগ্রহণ করছেন জনজাতি ভাই-বোনেরা। শ্রদ্ধাজাগরণের মাধ্যমে ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার কাজ চলছে ৫৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে। এই মুহূর্তে ৫৭৫ স্থানে ৬৯৫ প্রকল্প চলছে দক্ষিণবঙ্গে।

উন্মুক্ত হলো পুরীর রত্নভাণ্ডার, উদ্ধার প্রাচীন সমরাস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুরীর রত্নভাণ্ডারে মিলল প্রাচীন সমরাস্ত্র। জানা গিয়েছে যে রত্ন ভাণ্ডারের ভিতরের অংশ থেকে শতাব্দী প্রাচীন তলোয়ার, বর্শা ও বল্লম পাওয়া গিয়েছে। গত ১৮ জুলাই রত্ন ভাণ্ডারের ভিতরের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী স্থানান্তরের সময় প্রাচীনকালে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় বিস্মিত প্রত্নতত্ত্ববিদরা।

প্রসঙ্গত, প্রায় ৪৬ বছর ফের খুলেছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডারের দরজা। যদিও এর আগে রত্ন ভাণ্ডারের দরজা খুলেছিল, তবে তা বাইরের অংশ ছিল। এবার তালা ভেঙে কুঠুরির ভিতরে প্রবেশ করেছে ওড়িশা সরকারের মনোনীত ১১ সদস্যের দল।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডার খোলার পরই ভিতর থেকে বেশ কয়েকটি দেব-দেবীর মূর্তি উদ্ধারের কথা জানা গিয়েছিল। বহুমূল্যের বিভিন্ন ধাতু-নির্মিত ওই মূর্তিগুলি বহু দশক ধরে কুঠুরির ভিতরেই অযত্নে পড়ে থাকায়, তা সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়। রত্ন ভাণ্ডারের সমীক্ষা শেষের পর তা পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এবার প্রাচীন এই সমরাস্ত্র উদ্ধার নিয়ে ১১ সদস্যের দলের একজন জানান যে গত ১৪ জুলাই আমরা প্রাচীন কয়েকটি মূর্তি পেয়েছিলাম। এবার আমরা কিছু তলোয়ার ও বর্শা-বল্লম পেয়েছি। বিশালাকার একটি কাঠের সিন্দুকের পাশে এগুলি রাখা ছিল। এই অস্ত্রগুলি অত্যন্ত ভারী। এত বছর বন্ধ থাকায় এগুলি কালো হয়ে গিয়েছে।

রত্ন ভাণ্ডার সুপারভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ রথ জানিয়েছেন— আপাতত অস্ত্রগুলিকে সুরক্ষিতভাবে সিল করে অস্থায়ী স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১১৯০-এর দশকে রাজা অনন্তবর্মন দেব ১০.৭ একর জমির উপরে পুরীর জগন্নাথ মন্দির স্থাপন করেছিলেন। কথিত রয়েছে যে ১৪৬০ সালে রাজা কপিলেন্দ্র দেব ১৬টি হাতির পিঠে চাপিয়ে বিপুল সোনা ও ধনরত্ন এনে রত্ন ভাণ্ডারে গচ্ছিত রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কমপক্ষে ১৮ বার পুরী মন্দিরে হামলা ও লুঠপাট হয়। মন্দিরের সেবায়েতদের দাবি, রত্নভাণ্ডারের সম্পদ রক্ষা করতেই হয়তো রাজারা যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ভেতরে রেখেছিলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের লড়াইয়ে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেরিকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চড়ছে উত্তেজনা। কে হতে চলেছেন ডেমোক্র্যাটদের তরফে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, তা নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। তার মাঝে গত ২৩ জুলাই বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বার্তা দিলেন যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে লড়ার জন্য

ডেমোক্র্যাট শিবিরের অন্দরে প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়েছেন তিনি। আগস্টের ৭ তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টির মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে গত ২১ জুলাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বছর একাশির বৃদ্ধ জো বাইডেন। ডেমোক্র্যাট দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন— ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম, মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার ও পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর জোশ স্যাপিরো। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্ত্রী মিশেল ওবামা, কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেশার, মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুরের নাম নিয়ে গুঞ্জন চললেও কূটনীতিকদের মতে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন কমলা হ্যারিস। কারণ বাইডেন নিজে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। এছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল ও আমেরিকার বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে তিনি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

দুষ্কৃতীদের বাধায় বন্ধ হলো জুনপুটে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কিছু স্থানীয় লোকজনকে ঢাল করে রাজ্যের শাসক দলের কিছু দুষ্কৃতীদের বাধায় বন্ধই হয়ে গেল কাঁথির জুনপুটে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের কাজ। গত ১০ জুলাই থেকে কাজ বন্ধ রয়েছে বলে খবর। বাম আমলে পূর্ব মেদিনীপুরে হরিপুরে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৎকালীন শাসক বামফ্রন্টের অপদার্থতায় আর বিরোধী তৃণমূলের বাধায় রূপায়িত হয়নি। হরিপুর থেকে কাছেই জুনপুটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)-র ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের কাজ বন্ধের পিছনে রয়েছে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তৃণমূল।

গত ১৭ জুলাই থেকে ডিআরডিও-র বিমান মহড়া (ফ্লাইট ট্রায়াল) শুরু হয়েছে। সে জন্য প্রথম দফায় ১৯ জুলাই পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ২৪-২৬ জুলাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে জুনপুটে লঞ্চিং প্যাডের চারদিকে টিন দিয়ে ঘেরা হচ্ছিল। কলকাতার এক ঠিকাদার সংস্থা সেখানে কাজ করছিল। উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকে ঘেরাটোপ হয়েও গিয়েছে। তারপরেই বাধে ঝামেলা।

অভিযোগ, ১০ জুলাই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক আমিন সোহেলের নেতৃত্বে মৎস্যজীবীরা গিয়ে ঠিকাদার সংস্থাকে কাজ বন্ধ রাখতে বলেন। তারপরেই ঠিকাদারের লোকজন এলাকা ছাড়েন। এখন সেখানে নজরদারি চালাচ্ছেন বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা। জেলা পুলিশের একটি সূত্র মানছে, ডিআরডিও লঞ্চিং প্যাডের কাছে কিছু কাজ করবে বলে প্রথমে জানালেও পরে জানিয়েছে যে আপাতত কাজ বন্ধ। যদিও কারণ জানানো হয়নি। কাঁথি-১ ব্লকের বিডিও অমিতাভ বিশ্বাস বলেন— 'ডিআরডিও-র তরফে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে, সাময়িকভাবে তারা কাজ বন্ধ রাখছে'।

কাঁথির জুনপুটে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের লঞ্চিং প্যাড ঘেরার কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

জুনপুট মৎস্যখটির সভাপতি শেখ নজু ও সহকারী সম্পাদক জাহেদ আলির দাবি, মৎস্যজীবীরা ঠিকাদার সংস্থার লোকেদের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে সমস্যা মেটেনি। এই ঘটনায় যুক্ত তৃণমূল নেতা আমিনের বক্তব্য— 'অরাজনৈতিক ভাবে কয়েকটি মৎস্যজীবী সংগঠন, পরিবেশপ্রেমী ও বিজ্ঞান কর্মীরা ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের সমস্যা তুলে ধরে আন্দোলন করছেন। কাজ বন্ধ করার অভিযোগ ঠিক নয়'।

কাঁথির বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী বলেন— 'ডিআরডিও-র প্রকল্পের জন্য রাজ্য জমি দিয়েছে। তারপরেও কারা এই প্রকল্পে বাধা দিচ্ছে, তার তদন্ত হওয়া উচিত। ডিআরডিও দেশের সুরক্ষায় কাজ করে। এই ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চাইব'। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করেন— 'যে মন্ত্রক এই ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রের দায়িত্বে, তারা কি রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? জেলা প্রশাসনকে এই বাধার কথা জানিয়েছে?'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০২৫-এর মার্চে জুনপুট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ হওয়ার কথা। বছরে দু'-তিনবার পরীক্ষামূলক এই উৎক্ষেপণ হবে। সেই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নিয়ম অনুযায়ী মৎস্যজীবীদের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। তার জন্য সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের তরফে প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে। বিমান মহড়ার জন্য গত ১৭ জুলাই থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তা অগ্রাহ্য করে গত ১৭-১৮ জুলাই জুনপুটে মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে গিয়েছেন। দীঘা ফিশারমেন অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব কুমার করের দাবি, 'মহড়া বাতিল হয়ে গিয়েছে'। অথচ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল জানান, মৎস্য দপ্তর লিখিত নির্দেশিকা দিয়ে বলেছিল, ৬ দিন সমুদ্রে যাওয়া যাবে না। সেই নির্দেশ প্রত্যাহারের কথা তো জানানো হয়নি।

সহ-মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুমন কুমার সাহা বলেছেন— 'ডিআরডিও নির্দেশিকা প্রত্যাহারের কথা জানায়নি। গত ৩ জুলাইয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৭-১৯ ও ২৪-২৬ জুলাই সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে'।

দেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিচ্ছেন চীনা বিত্তশালীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চীন থেকে ধীরে ধীরে উধাও হয়ে যাচ্ছেন সেই দেশের বিত্তশালীরা। সে দেশে কমছে ধনীদের সংখ্যা। তাঁরা রহস্যময়ভাবে গায়েব হচ্ছেন না, বরং পাততাড়ি গোটাচ্ছেন চীন থেকে। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী— বিশ্বের প্রায় ২,৭০০ জন শতকোটিপতিদের মধ্যে ৬০০ জনেরও বেশি চীনের বাসিন্দা ছিলেন। তবে ফোর্বস্ পত্রিকা অনুযায়ী— গত বছর সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫৬২-তে। বছয় দুয়েক আগে থেকেই চীনা বড়লোকদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গত বছরেও বড়ো মাপের অনেক চীনা ব্যবসায়ী চীন ছেড়েছেন। কেন এই ধনবানরা চীন-বিমুখ? আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি— এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে চীন সরকারের কড়া পদক্ষেপ এবং চীনের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে দেশ ছাড়ছেন চীনা অভিজাতরা। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের অর্থও।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের অর্থ বিদেশে নিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছেন চীনা বিত্তবানরা। এই কারণে চাপের মুখে পড়েছে শি জিনপিং সরকার। বর্তমানে চীনা সরকারের জারি নিয়ম অনুযায়ী— কোনো ব্যক্তি কেবল ৫০ হাজার ডলার দেশের বাইরে পাঠাতে পারেন। কিন্তু চীনা বিত্তশালীরা তাঁদের টাকা দেশের বাইরে পাঠাতে এতটাই সচেষ্ট হয়েছেন যে কখনও কখনও বেআইনি ভাবেও দেশের বাইরে তাঁরা টাকা পাঠাচ্ছেন। গত বছরের আগস্টে সাংহাইয়ের পুলিশ ১১০ লক্ষ পাউন্ডের বেশি অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা লেন-দেনের অভিযোগে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল।

করোনা মহামারীর আগে চীন থেকে প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি ডলার পর্যটকদের হাত ধরে বিদেশে পাড়ি দিত বলে দাবি করেছে ফরাসি ব্যাংকগোষ্ঠী নাটিক্সিস। করোনা পরবর্তী পর্যায়ে পর্যটন আগের অবস্থায় না ফিরলেও আমেরিকার উচ্চ সুদ ও দুর্বল ইউয়ানের ফলে বিত্তশালী চীনারা তাঁদের অর্থ দেশে সরিয়ে ফেলছেন। ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে চীনের অর্থ আদান-প্রদানের ভারসাম্যে ১৯৫০ কোটি ডলারের ঘাটতি ছিল। কোনো দেশ থেকে বিদেশে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ যদি বিদেশ হতে সেই দেশে পৌঁছনো অর্থের তুলনায় বেশি হয় তবে তাকে 'কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই সূচকের মাধ্যমে দেশে অর্থ আদানপ্রদানের হিসাব রাখে সরকার। অর্থনীতিবিদদের একাংশের দাবি চীনের টাকা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি। তাদের মতে, ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক নীতি এবং ব্যবসার সুযোগ সম্পর্কে চীনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টির কারণে তাদের সঞ্চয় দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছেন সে দেশের সম্পদশালীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালে চীনের বিত্তশালীদের দেশের স্বার্থে তাঁদের সম্পদ আরও বেশি ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল জিনপিং সরকার। ২০১৫ সালে চীনা মুদ্রা ইউয়ানের দাম পড়ার পর হাজার হাজার কোটির ক্ষতির মুখে পড়ে চীন। তারপর থেকেই দেশের সম্পদের ওপর দখল পোক্ত করার চেষ্টা করছে বেজিং। এই সময় জ্যাক মা-র মতো চীনা ধনকুবেররা চীনের অর্থনীতি নিয়ে খোলাখুলি সোচ্চার হতে শুরু করলে, তাদের প্রশ্নের জবাবে আরও কড়া হয় সরকার। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে— আয়তনে ছোটো প্রতিবেশীদের ভয় দেখিয়ে অনেক দিন ধরেই সেই দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে চীন। সামরিক মহড়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ছোটো দেশগুলির সামনে ক্ষমতার আস্ফালনও দেখাচ্ছে মাঝেমধ্যেই। ফলে দক্ষিণ চীনসাগরে যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন অনেকেই। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা করে গত কয়েক মাস ধরে চীনের অনেক বিত্তশালী ব্যবসায়ী চীন ছেড়ে ভিন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত।

ভারতে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা

সম্প্রতি সামনে এসেছে একটি সমীক্ষায় উঠে আসা এক তথ্য। তাতে দেখা গিয়েছে ভারতে সব থেকে বেশি মানুষ কথা বলেন হিন্দিতে। প্রায় ৫২৮ মিলিয়ন (৫২ কোটি ৮০ লক্ষ)। বাংলাতে কথা বলেন ৯৭ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। মারাঠিতে কথা বলেন ৮৩ মিলিয়ন (৮ কোটি ৩০ লক্ষ) মানুষ। তেলুগুতে কথা বলেন ৮১ মিলিয়ন (৮ কোটি ১০ লক্ষ) মানুষ। তামিল ভাষায় কথা বলেন ৬৯ মিলিয়ন (৬ কোটি ৯০ লক্ষ) মানুষ। গুজরাতিতে ৫৫ মিলিয়ন (৫ কোটি ৫০ লক্ষ) মানুষ। উর্দুতে ৫০ মিলিয়ন (৫ কোটি) মানুষ। কন্নড় ভাষায় ৪৩ মিলিয়ন (৪ কোটি ৩০ লক্ষ), ওড়িয়াতে ৩৭ মিলিয়ন (৩ কোটি ৭০ লক্ষ) ও মালয়ালম ভাষায় কথা বলেন ৩৪ মিলিয়ন (৩ কোটি ৪০ লক্ষ) মানুষ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

‘ভারত যাদের মামাবাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি’
বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলনে ভারত বিদ্বেষী স্লোগান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশি মুসলমানদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে চরম ভারত বিদ্বেষী মানসিকতা। পাকিস্তানের মতোই কট্টর ইসলামপন্থা ও জেহাদি প্রবৃত্তি গ্রাস করেছে বাংলাদেশকে। ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে যে কোনো ইস্যুতে ভারতের চরম বিরুদ্ধাচারণ করে চলেছে বাংলাদেশি জেহাদিরা। বাংলাদেশের চলমান সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনেও তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো, উঠলো ভারত বিদ্বেষী স্লোগান। ভারতের প্রতি বিদ্বেষমূলক স্লোগান দেওয়া বাংলাদেশি মুসলমান ছাত্রদের মিছিলের একটি ভিডিয়ো এক্স-হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র প্রতাপ সিংহ। মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া একজন নেতাকে বলতে শোনা যায়— ‘ভারত যাদের মামার বাড়ি— বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি’। এছাড়াও এই মিছিলে ‘দিল্লি না ঢাকা— ঢাকা ঢাকা’, ‘ভারতের আগ্রাসন— রুখে দাও জনগণ’, ‘ভারতীয় পণ্য— বর্জন বর্জন’ ইত্যাদি স্লোগান ওঠে।

এই ভিডিয়োটি শেয়ারের পাশাপাশি জিতেন্দ্র প্রতাপ সিংহ তাঁর এক্স-হ্যান্ডেলে লিখেছেন— ‘বাংলাদেশে চলমান সংরক্ষণ বিরোধী বিক্ষোভ এখন ভারত বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী হিংসায় রূপান্তরিত হয়েছে। একজন তথাকথিত প্রতিবাদী মাইকে বলছেন— ‘ভারত যাদের মামার বাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি’। অর্থাৎ, যাদের মামার বাড়ি ভারতে, তাদের দ্রুত বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই হিংসার আড়ালে বাংলাদেশে যে গুটিকয়েক হিন্দু অবশিষ্ট আছে, তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হচ্ছে এবং সারা বাংলাদেশে ভারত বিরোধী পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।’

বাংলাদেশ জুড়ে জেহাদিদের তৈরি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে গত ২১ জুলাই বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংরক্ষণ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশ জারি করেছে। বাংলাদেশ হাইকোর্টের নির্দেশকে পরিবর্তন করে সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণা— সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে হলেও, ৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া পরিবারগুলির জন্য। এর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা পরিবারগুলির সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের বিধান ছিল। জেহাদিদের হিংসাত্মক আন্দোলনে ও প্রবল চাপে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই সংরক্ষণের নিয়ম বাতিল করে। সেই বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের তরফে বাংলাদেশ হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়। এই মামলার প্রেক্ষিতে গত জুন মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্ট সংরক্ষণের সেই বিধি পুনরায় কার্যকর করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্তম্ভ স্বরূপ। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সম্মান তাঁদের প্রাপ্য। এই কারণে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পক্ষপাতী ছিল বর্তমান বাংলাদেশ সরকার। এই নির্দেশের প্রয়োগ রুখতে ঢাকা-সমেত গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। রাস্তা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হোস্টেল চত্বরগুলিতে আন্দোলনরত ছাত্ররা পুলিশের ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে। গত ১৬ জুলাই হিংসাত্মক আন্দোলন চরম সীমায় পৌঁছায়। বিভিন্ন স্থানে জেহাদিদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ চলে। উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে, আন্দোলনের নামে জেহাদিদের ছড়ানো হিংসা মোকাবিলায় পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রবার বুলেট ও স্মোক গ্রেনেড ব্যবহার করে। হিংসা রুখতে বাংলাদেশ প্রশাসনের তরফে জারি করা হয় কার্ফু। জেহাদি প্রচার ও উসকানি রুখতে ইন্টারনেট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেনার টহলদারি শুরু হয়। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কার্ফু ঘোষণার পর ‘শ্যুট অন সাইট’ বা দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয় সেনাকে। বাংলাদেশ প্রশাসনের তরফে এই হিংসায় হতাহতের কোনো সংখ্যা জানানো না হলেও গত ২০ জুলাই বাংলাদেশি দৈনিক ‘প্রথম আলো’য় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এই হিংসায় ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ মানুষের জরুরি কাজকর্মের জন্য ২১ জুলাই, বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করার কথা ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। হাসিনা বিরোধী দল বিএনপি ও জামাতের প্রত্যক্ষ মদতে বাংলাদেশ জুড়ে হিংসা ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ। হিংসা বন্ধে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্রের খোঁজে গত ১৯ জুলাই সরকার ও সংরক্ষণ-বিরোধীদের মধ্যে একটি বৈঠক আয়োজিত হয়। কোটা সিস্টেম বা সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার, সংঘর্ষ চলাকালীন পুলিশের তরফে বন্ধ করা ছাত্রদের হোস্টেল ও ডর্মিটরিগুলি পুনরায় চালু করা, ক্যাম্পাসে হিংসা রুখতে ব্যর্থ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় আধিকারিকের পদত্যাগের দাবিগুলি এই বৈঠকে সংরক্ষণ বিরোধীদের তরফে উত্থাপিত হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এই বৈঠকে সরকারের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ জারির পর বাংলাদেশ জুড়ে হিংসা ও এই ইস্যুতে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হয় কিনা তার দিকে নজর রেখেছে বিশেষজ্ঞ মহল।